ww Contents net.com represents

Dr. Zakir Naik's Bangla Ebook

HINDU DHORMO O ISLAMER SADRISSO

(SIMILARITIES BETWEEN HINDUISM AND ISLAM)

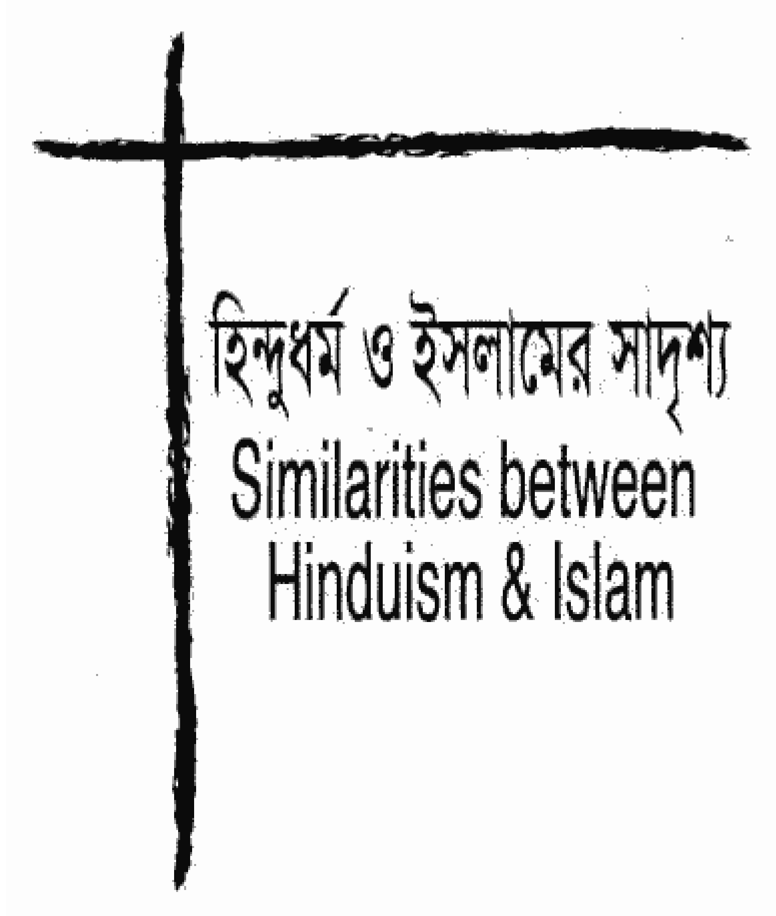

Contents

সূচিপত্র

- প্রসঙ্গ কথা –৩১১
- ধর্ম সম্পর্কে জানার সঠিক পদ্ধতি –৩১২
- হিন্দু ও সনাতন ধর্ম –৩১৪
- ইসলাম ও মুসলিম –৩১৬
- ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ধর্মবিশ্বাস –৩১৯
- ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সমার্থক ভাষ্য –৩২৮
- ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে দূত ও গ্রন্থ –৩২৯
- ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে নবী-রাসূল ও অবতার –৩৩৬
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মে স্রষ্টার গুণাবলি –৩৪০
- স্রষ্টার বিশেষ বৈশিষ্ট্য –৩৪২
- হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (স) –৩৪৬
- হিন্দুধর্ম ও ইসলামে পরকাল –৩৪৮
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মে অদৃষ্টবাদ –৩৫৬
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মে উপাসনা –৩৬১
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সংগ্রাম –৩৬৭
- কুরআন ও বেদে সাদৃশ্য –৩৭১

প্রসঙ্গ কথা

ভাষা, সংস্কৃতি, বর্ণ প্রভৃতিতে মানুষে মানুষে রয়েছে ভিন্নতা। আছে চিন্তা-চেতনার পার্থক্য। তবে প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। বরং রয়েছে মৌলিক সাদৃশ্য। অর্থাৎ কার্যপ্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও তাদের চিন্তা-চেতনা, নৈতিক ও আত্মিক বিশ্বাস এবং ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ক্ষেত্রেই সমান্তরাল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ তথ্যসমূহ অনুদঘাটিত। যেমনটা প্রধান ধর্মসমূহে লক্ষ্যণীয়।

ইসলাম ও হিন্দু ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি প্রধান ধর্ম। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করলেও এ ধর্মানুসারীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় আচারগত বিভাজন। এ বিশ্বাসগত বিভাজন এদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পার্থক্যের জন্ম দিয়েছে। তবে এ দুটি ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃত উৎস এবং পবিত্র গ্রন্থগুলোতে রয়েছে বিস্তর মিল। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদ এবং ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের মূল সুর প্রায় ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। উভয়েই একত্ববাদে বিশ্বাসী। অদৃষ্টবাদ, স্রষ্টার প্রতিনিধি মনোনয়ন, ধর্মের পথে সংগ্রাম প্রভৃতি ছাড়াও উভয় ধর্মের অনুসারীরাই মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদি বিষয়ে অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় হিন্দু ধর্ম ও ইসলামে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা প্রকারান্তরে মানুষের প্রকৃত ধর্মের অভিন্নতাকেই প্রমাণ করে।

banglainternet.com

ধর্ম সম্পর্কে জানার সঠিক পদ্ধতি

বিশ্বের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম– হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ অথবা উভয়টির জন্য প্রযোজ্য একই ক্ষেত্র সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা সময়ের দাবি। উপস্থাপিত বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েই করা হয়েছে। আয়াতটি হলো :

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ : আপনি বলে দিন! হে আহলে কিতাব! এসো সেই ঐক্যবাণীর ভিত্তিতে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন; তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি এবং কোনো কিছুকেই যেন তার শরীক সাব্যস্ত না করি, আর আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম।'

হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের সাদৃশ্য সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমেই এ দু'টি ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের দিকে নজর দিতে হবে।

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে যদিও বিশেষভাবে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে এ আয়াতটি দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে বোঝানো যায়। আর আমার মতে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর কাছে মূল সত্য পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি মূল চাবিকাঠি। হোক তার বিশ্বাসের ভিত্তি আলাদা। কারণ আল্লাহ বলেছেন, এসো সেই কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক। তাহলে প্রথম সাদৃশ্য হচ্ছে– আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করি না। আমরা কোনো কিছুকে তার শরীক করি না।

ধর্মের অনুসারী নয় উৎস সম্পর্কে জানুন

পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কোনো একটি ধর্ম জানাই যথেষ্ট নয়। সবার আগে আপনাকে এ ধর্মটা বুঝতে হবে। এটা ঐ ধর্মানুসারীদের জীবনাচার দেখে বুঝা সম্ভব নয়। কারণ, প্রায়ই দেখা যায় অনুসারীরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এ বিষয়টি হিন্দুধর্মের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের বেলায়ও। একটি ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য ঐ ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করা যে কারো জন্য সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ অনুসারী তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং যথাযথভাবে অবহিত নয়। এভাবে কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে জানা অর্থাৎ, ঐ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খোলামনে অধ্যয়ন করা।

'বেদ' হিন্দুধর্মের ভিত্তি

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে এ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা। এর উপায় হচ্ছে হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বেদ, আরো আছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদগীতা ও পুরাণ যেমন– মনুসঙ্গীতা। আর তাই বেদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করলে আমরা হিন্দুধর্ম বুঝতে পারব পুরোপুরি, সঠিকভাবে।

আমাদের আলোচনার বিষয় 'হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাদৃশ্যসমূহ'। এখানে আমরা ঐসব মিলসমূহের আলোচনা করব না যেগুলো এ উভয় ধর্মের অধিকাংশ অনুসারীদের জানা রয়েছে। যেমন, একজন মানুষের সবসময় সত্য কথা বলা উচিত। মিথ্যা বলা ও চুরি করা উচিত নয়। তাকে দয়ালু হওয়া উচিত, তার নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি। এর পরিবর্তে ঐসব মিলসমূহই পর্যালোচনার দাবী রাখে যেগুলো এ উভয় ধর্মের সকল অনুসারীদের সাধারণভাবে জানা নেই এবং এগুলো তাদেরই জানা রয়েছে যারা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

অর্থাৎ, আমাদেরকে বিশ্বের এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে এ ধর্ম দু'টির প্রকৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাই এগুলো সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হলো।

কুরআন ও হাদীস ইসলাম ধর্মের ভিত্তি

যদি আমরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে চাই তবে আমাদেরকে পড়তে হবে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত আসমানী কিতাব ইসলামের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ আল কুরআন। এ গ্রন্থটি মহান স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর নাযিল করেছেন। আর আমরা যদি কুরআন বুঝতে চাই তবে আমাদেরকে নবীর সুন্নাহ বা হাদীস সম্পর্কে জানতে হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন– وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا .

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

'আল্লাহর রজ্জু বলতে এখানে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে মুসলমানদের বিভক্ত থাকা উচিত নয়। আর তাদের ঐক্যের মূলভিত্তি হলো ইসলাম ধর্মের প্রকৃত উৎস তথা মহাগ্রন্থ 'আলকুরআন'। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূল (স) এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করো।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো– যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে– সেই নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর দেয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হলো ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর তা হলো– মহিমান্বিত আলকুরআন (যা মহান আল্লাহর কথা) এবং সহীহ হাদীসসমূহ যা মহানবী (স) এর নিজস্ব উক্তি এবং অনুমোদন।

হিন্দু ও সনাতন ধর্ম

হিন্দু কী

'হিন্দু' শব্দটির ভৌগোলিক বিশেষত্ব আছে। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকদেরকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যারা সিন্ধু নদের তীরে থাকে অথবা সিন্ধু নদের পানি দ্বারা

সিক্ত হয় এমন এলাকায় বসবাস করে। অথবা সেই মানুষগুলো যাদের পাশদিয়ে বয়ে গেছে সিন্ধু নদ।

ঐতিহাসিকদের মতে, এ শব্দটি প্রথম ঐসব পারস্যবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল যারা হিমালয় পর্বতের উত্তর–পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমন করেছিল। তাছাড়া আরবীয়রা ভারতীয়দের বুঝাতে হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করত।

মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের কোথাও 'হিন্দু' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। শব্দটি Encyclopedia of Religions and Ethics গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খন্ডের : ৬৯৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে।

পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু তাঁর 'Discovery of India' বইয়ের ৭৪ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী পূর্বে 'হিন্দু' (যার অর্থ তান্ত্রিক) শব্দটি দ্বারা একদল 'মানুষকে' বুঝানো হতো এবং কোনোভাবেই নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানো হতো না। 'হিন্দু' শব্দটির দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানো নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ঘটনা।

সর্বোপরি বলা যায় যে, 'হিন্দু' শব্দটি একটি ভৌগোলিক পরিভাষা যেটা 'সিন্ধু' নদের তীরে বসবাসকারী লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বিশেষ করে যারা ভারতে বসবাস করে তাদের বোঝাতে।

হিন্দুরা সনাতন ধর্মের অনুসারী

হিন্দুতত্ত্ব বা হিন্দুধর্ম কথাটি 'হিন্দু' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আর শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন একজন ইংরেজ। এ শব্দটি দিয়ে তারা ভারতে বসবাসরত মানুষের ধর্মবিশ্বাস রীতিনীতিকে বুঝাত। 'New Encyclopedia Britanica' এর ২০ তম খন্ডের ৫৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'হিন্দুধর্ম' নামটি ইংরেজি ভাষায় ইংরেজরা ব্যবহার শুরু করে। শব্দটির মাধ্যমে হিন্দুস্থানের জনগণের বহুবিধ বিশ্বাস বা চেতনাকে বোঝানো হয়ে থাকে। বৃটিশ লেখকরা ১৮৩০ সালে প্রথম 'হিন্দুধর্ম' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। এর দ্বারা মূলত ভারতের ঐসব সমবিশ্বাসী লোকদেরকে বুঝানো হতো যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়।

হিন্দু পন্ডিতদের অভিমত, 'হিন্দুইজম' বা 'হিন্দুতত্ত্ব' শব্দটি একটি মিথ্যা পরিভাষা। তাদের মতে, 'হিন্দুধর্ম' বলতে 'সনাতন ধর্ম'কে বুঝানো হয়ে থাকে। সনাতন ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন ধর্ম অথবা এর দ্বারা বৈদিক ধর্মকে বুঝায় যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ -এর মতে, 'এ ধর্মের অনুসারীরা 'বেদতত্ত্ববাদী' হিসেবে পরিচিত।

তাহলে সংক্ষেপে বলা যায়, হিন্দু ধর্মের একটি ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে। তাই এখানে আমি এ হিন্দুধর্ম আর ইসলামের সাদৃশ্য উপস্থাপন করব। তবে সেই সাদৃশ্যগুলো নয়, যেগুলো দু'ধর্মের অনুসারীরাই জানেন। যেমন ধরুন দু'টি ধর্মই বলে, সত্য কথা বলুন। মিথ্যা যে বলা উচিত নয়। আপনি দয়ালু হোন, নিষ্ঠুর হবেন না। সত্যি বলতে আমি এখানে আলোকপাত করব সেইসব সাদৃশ্য যেগুলো সম্পর্কে এ দু'ধর্মের বেশীর ভাগ অনসারীই জানেন না।

প্রসঙ্গত, আমরা ইসলাম ধর্মের আকিদার বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ঐগুলোকে হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে দেখবো। আমরা আরো পর্যালোচনা করবো ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে এবং উভয়ের মাঝে তুলনামূলক আলোচনাও করব।

ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম কী

اِسْلَام 'ইসলাম' একটি আরবি শব্দ। سَلَّمَ 'সালমুন' শব্দ থেকে এটির উৎপত্তি। যার অর্থ শান্তি। অথবা سَلَّمَ 'সেল মুন' থেকে। যার অর্থ 'তোমার ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ কর।' সংক্ষেপে বলা যায়, 'ইসলাম' অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ তাআলার কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।'(Muslim is a person who submits his will to almighty Allah)

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় اِسْلَام 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১৯ ও ৮৫ নং আয়াতে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে।- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

অর্থ : কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের আলোকে মুসলিম

মুসলমান হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তার সকল সামর্থ্যকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেন। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন স্থানে 'মুসলিম' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ : তোমরা সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়

কিছু কিছু লোকের মধ্যে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তা হচ্ছে ইসলাম একটি নতুন ধর্ম যা মাত্র ১৪০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ইসলামের উৎপত্তি ঘটেছে সৃষ্টির প্রথম লগ্নে যখন মানুষ এই পৃথিবীতে পা রেখেছিল। আর মহানবী (স) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন; বরং তিনি হলেন ইসলামের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। যা হোক, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো একক ধর্মের নাম নয়, যা হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রথম বারের মতো উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে অর্থে তাঁকে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তা যথার্থ নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, মানুষের পূর্ণ আনুগত্য কেবল এক সৃষ্টিকর্তা প্রভুর জন্যই নির্ধারিত। এটা মানবজাতির মহান প্রভুর এমন একটি বিশেষ হিদায়াত যা সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়ে আসছে। হযরত নূহ (আ), হযরত সোলাইমান (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)সহ অন্য নবীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের সকলেই একই বিশ্বাস ও তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়াত) এবং আখিরাত (পরকাল) সম্পর্কে একই তথ্য ও খবর পরিবেশন করেছেন। উল্লিখিত সম্মানিত নবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না- যা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্ববর্তীদের প্রচারিত আকিদা এবং বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মহান আল্লাহর সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাঁর দ্বারা অনুরূপ নির্ভেজাল আকিদার পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন- যা তাঁর পূর্বে সকল নবীই প্রচার

করেছিলেন। এ নির্ভেজাল বাণী ইতোপূর্বে কলুষিত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন সময় মানুষের দ্বারা বহুবিধ ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তারা নানা বিকৃতিসহ বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে একটি শাশ্বত নির্ভেজাল আকিদায় ভেজাল ও ভুল আকিদার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা এসব ভুল আকিদার সংশোধন করা এবং ইসলামের সঠিক ও চিরন্তনরূপ মানবজাতির সামনে তুলে ধরার জন্যে মহানবী মুহাম্মদ (স) কে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ (স) এর পরে যেহেতু আর কোনো নবীর আগমন হবে না; তাই তাঁর প্রতি এমন একটি মহান আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল (মহিমান্বিত কুরআন) যে গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে পরবর্তীকালে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তা হিদায়াতের একমাত্র উৎস হিসেবে টিকে থাকতে পারে। এভাবে সকল নবীর প্রচারিত ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল– 'মহান আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ' এবং এজন্য একটি মাত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় 'ইসলাম'। হযরত ইবরাহিম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)ও মুসলমান ছিলেন। যেমন, আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন–

فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۔

অর্থ : তারপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফরী উপলব্ধি করতে পারলেন তখন তিনি বললেন, কেউ আছে কি আল্লাহর প্রতি অনুরাগী আমার সাহায্যকারী? সঙ্গী সাথীরা বললেন, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা তো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

এছাড়া হযরত ইবরাহিম (আ) সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۔ وَمَا كَانَ مِنَ
ٱلْمُشْرِكِينَ ۔

অর্থ : ইবরাহিম (আ) ইহুদি বা নাসারা ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ধর্মবিশ্বাস

কুরআন ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ। আর বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি হলো হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে উভয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা মহিমান্বিত কুরআনের সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে বলেছেন–

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ ۔

অর্থ : পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে তোমাদের কোনোই পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে।

ঈমান প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের কিতাবুল ঈমানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে– একজন লোক মহানবী (স) এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী (স)! ঈমান কী? জবাবে নবী করীম (স) তাঁকে বললেন, 'ঈমান হচ্ছে তুমি বিশ্বাস আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর নবীগণের প্রতি, পরকালের পুনরুত্থানের প্রতি এবং তোমার তাকদীরের (অদৃষ্টের) প্রতি।' সুতরাং ইসলামের প্রধান শর্ত ৬টি। এগুলো হলো–

১. তাওহীদ : সকল সৃষ্টির স্রষ্টা একক ও চিরন্তন। তার কোনো শরীক নেই– এরূপ বিশ্বাস;
২. আল্লাহর ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস;
৩. আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস;
৪. নবীগণের প্রতি বিশ্বাস;
৫. পরকালে বিশ্বাস;
৬. অদৃষ্টে বিশ্বাস।

এ পর্যায়ে আমরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলি সম্পর্কে কী কী ধারণা দেয়া হয়েছে তা ঐ ধর্ম দু'টির ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করবো এবং এ দু'টির মাঝে কোনো সমতা আছে কিনা তাও পর্যালোচনা করবো। প্রথমে আমরা হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য আছে তা আলোচনা করবো।

banglainternet.com

হিন্দুধর্মে 'প্রভু'

কোনো সাধারণ হিন্দুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কয়জন খোদায় বিশ্বাস করে? তাদের কেউ কেউ বলবে, তিনজন। কেউ বলবে দশ জন, কেউ হয়ত বলবে, একজন। আবার কেউ বলবে, এক হাজার জন। কেউ হয়তো এটাও বলবে, তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি এ প্রশ্নটি কোনো একজন হিন্দু পন্ডিতকে করা হয়, যিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলবেন, একজন হিন্দু অবশ্যই এবং প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রভুতে বিশ্বাস করেন এবং কেবল একজন সৃষ্টিকর্তারই উপাসনা করেন।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য

একজন সাধারণ হিন্দু যে ধর্মবাদে বিশ্বাস করে সেটি হলো Pantheism বা সর্বেশ্বরবাদ। ইসলাম বলে, Everything is God's অর্থাৎ 'সবকিছুই আল্লাহর (সৃষ্টি)'। পক্ষান্তরে, হিন্দুধর্মে বলা হয়, Everything is God অর্থাৎ 'সবকিছুই প্রভু'।

একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো– একজন সাধারণ হিন্দু সর্বেশ্বরবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে, 'সবকিছুই প্রভু, গাছ একজন প্রভু, সূর্য একজন প্রভু, চন্দ্র একজন প্রভু, সাপ একজন প্রভু, বানর একজন প্রভু, মানুষ একজন প্রভু।' পক্ষান্তরে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, 'এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহর (সৃষ্টি)।'

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই প্রভুর (সৃষ্টি)। অর্থাৎ সবকিছুই প্রভুর সাথে (স্রষ্টা-সৃষ্টির) সম্পর্কিত। সবকিছুই এক এবং একমাত্র একক চিরন্তন সত্তার মালিকানাধীন। গাছের মালিক প্রভু, সূর্যের মালিকও প্রভু, চন্দ্রের মালিকও প্রভু, সাপের মালিকও প্রভু, বানরের মালিকও প্রভু, মানুষের মালিকও প্রভু। অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বা মালিক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

তাই হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 'সম্বন্ধবাচক' শব্দের ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। হিন্দুরা বলেন, 'সবকিছুই প্রভু'। আর মুসলমানরা বলেন, 'সবকিছুই প্রভুর'। আমরা যদি সম্বন্ধবাচক 'র' অক্ষরটির ব্যবহারজনিত সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে হিন্দু এবং মুসলমানরা এক হয়ে যাবে। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আর সেটা কীভাবে পারব? এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ.

অর্থ : তোমরা এমন সাধারণ বিষয়ের প্রতি আসো– যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক। এই জন্য যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না।

কাজেই আমাদেরকে এমন সব সমান বিষয় আলোচনা করা দরকার যেগুলো ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়।

উপনিষদ

উপনিষদ হচ্ছে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

- ❑ চান্দগোয়া উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ২ নং খণ্ডের ১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'স্রষ্টা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।'

  (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৪৪৭ এবং ৪৪৮ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, খণ্ড-১, উপনিষদ, ১ম অংশের ৯৩ নং পৃষ্ঠা)

- ❑ Suvas vatara উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তাঁর কোনো প্রভুও নেই'।

  (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদের ৭৪৫ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড-১৫, উপনিষদ ২য় অংশের ২৬৩ নং পৃষ্ঠা)

- ❑ সেতাসুত্র উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'স্রষ্টার মতো আর কেউ নেই।'

  (রাধাকৃষ্ণের মূল উপনিষদের ৭৩৬, ৭৩৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড ১৫, উপনিষদ ২য় অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠায়)।

- ❑ একই উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে– "স্রষ্টা হলেন নিরাকার, কেউ তাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে পায় না"

  (রাধাকৃষ্ণের রচিত মূল উপনিষদ ৭০৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড ১৫, উপনিষদ ২ নং অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠা)

ভগবদগীতা

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা। এ গ্রন্থের ৭ ম অধ্যায়ের ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ -এ বলা হয়েছে, 'যাদের বিচার-বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তারা অপদেবতার উপাসনা করে অর্থাৎ 'যারা জড়বাদী তারাই শুধু

অপদেবতার উপাসনা করে।'– এ কথার অর্থ হচ্ছে জড়বাদীরা সত্য প্রভুকে ছেড়ে প্রতিমার উপসনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে।

এছাড়া ভগবদগীতার ১০ : ৩ নং শ্লোকে বর্ণিত আছে– 'তিনি সেই সত্তা যিনি আমাকে জন্মের পূর্বে থেকেই জানেন, যাঁর কোনো আদি নেই, তিনি হচ্ছেন জগৎসমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু।'

চতুর্বেদ

বেদ হচ্ছে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র গ্রন্থ। মৌলিকভাবে বেদ ৪ প্রকার। যথা- ১. ঋগবেদ, ২. জজুরবেদ, ৩. শামবেদ এবং ৪. অথর্ববেদ।

ঋগবেদ

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো ঋগবেদ।

- ঋগবেদ বই নং ১, স্তুতিগান নং ৬৪, ধারা ৪৬ এ বলা হয়েছে – 'মহাজ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে।' সত্য এক, প্রভু একক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে ডেকে থাকেন। এ একই কথা বলা হয়েছে ঋগবেদের বই নং ১০, অনুচ্ছেদ ১১৪ পরিচ্ছেদ-৫-এ।
- ঋগবেদের বই ২, স্তুতিস্তাবক-১-এ বলা হয়েছে ঋগবেদের মহাক্রম প্রভুর কমপক্ষে ৩৩টি গুণাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব গুণের অনেকের বর্ণনাই ঋগবেদের বই-২, ১ নং অনুচ্ছেদ এর ২য় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।

জজুরবেদ

- জজুরবেদের ৩২ অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে– না তাস্তি প্রতিমা আস্তি অর্থাৎ 'তাঁর ব্যাপারে কোনো কল্পনা করা যায় না।' এটা আরো বলেছে, "তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা যিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।' (জজুরবেদ ৩২ : ৩) *(দ্রষ্টব্য : দেবী চাঁদ এম. এ. কর্তৃক রচিত জজুর বেদ, পৃষ্ঠা ৩৭৭)*
- জজুরবেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে– 'তিনি হচ্ছেন নিরাকার এবং বিশুদ্ধ।' *(দ্রষ্টব্য : র‍্যালফ আই. এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত জজুরবেদ, পৃষ্ঠা ৫৩৮)*
- জজুরবেদের ৪০ অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদ বলছে, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে। এখানে আরো (র‍্যালফ আই. এইচ গ্রিফিথ রচিত জজুরবেদ শ্যামহিতা, পৃষ্ঠা ৫৩৮) উল্লেখ আছে তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা সৃষ্টির পূজা করে মানুষের তৈরি জিনিসে।

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের ৫৮ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– ব্রহ্ম মাহা আদি অর্থাৎ 'প্রভু অত্যন্ত মহান'। (অথর্ববেদের খণ্ড ২, উইলিয়াম ড্রুইট-হিটটি, পৃষ্ঠা- ৯১০)

ব্রহ্মা অর্থ সৃষ্টিকর্তা

ঋগবেদে স্রষ্টার যেসব গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রভুর অন্যতম সুন্দর গুণ হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ব্রহ্ম (ঋগবেদ বই-২, স্তুতিবিচক শ্লোক-৩)। 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। শব্দটির আরবি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'খালিক'। ইসলাম মহান প্রভুকে খালিক, স্রষ্টা বা ব্রহ্ম বলে ডাকতে নিষেধ করে না। কিন্তু কেউ যদি বলে ব্রহ্ম, তথা সর্বশক্তিমান প্রভুর চারটি মাথা আর প্রতি মাথায় একটি মুকুট এবং চারটি হাত আছে, তবে এক্ষেত্রে ইসলামের প্রবল আপত্তি রয়েছে। কারণ, এ ধরনের বর্ণনা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা জজুরবেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে উল্লিখিত বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, 'তাঁর সম্পর্কে কল্পপনাও করা যায়না' অর্থাৎ স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই।

বিষ্ণু অর্থ পালনকর্তা

ঋগবেদে প্রভুর আরেকটি সুন্দর গুণের কথা বলা হয়েছে। যেমন বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, শ্লোক নং-৩ এ 'বিষ্ণু'র উল্লেখ আছে। 'বিষ্ণু' শব্দটির অর্থ হচ্ছে রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা। আপনি যদি এ শব্দটিকে আরবিতে অনুবাদ করেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'রব'। আর কেউ যদি সর্বশক্তিমান প্রভুকে 'রব', 'রক্ষাকর্তা' কিংবা 'বিষ্ণু' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাতে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, বিষ্ণুই হলেন সেই ঈশ্বর যিনি বসে আছেন সাপকে আসন বানিয়ে, সমুদ্রের নিচে ভ্রমণ করেন, গরুর নামক এক পাখির পিঠে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়ান, তার চারটি হাত আছে, ডান হাতদ্বয়ের একটি হাত দ্বারা শঙ্খ বর্ম এবং বিষ্ণু পাখি কিংবা সাপের ছোবলের বাহনে উপবিষ্ট- তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের ঘোর আপত্তি আছে। কারণ, বিষ্ণুর এ ধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান প্রভুর আকৃতি সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা জজুরবেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণনার [সেখানে বলা হয়েছে, না আস্তি প্রতিমা আস্তি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের কোনো প্রতিমূর্তি নেই।] সম্পূর্ণ বিপরীত।

banglainternet.com

- ঋগবেদ খণ্ড-৮, স্তুতিবাচন অনুচ্ছেদ-১, শ্লোক নং-১ এ বলা হয়েছে–! মা চদিনদি সানসাদ 'তিনি (প্রভু) ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না। তিনি একমাত্র স্বর্গীয়। কেবল তারই প্রশংসা করো।' (ঋগবেদ সমিতি, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১ ও ২)
- ঋগবেদ খণ্ড-৫, স্তুতিস্তাবক-৮১, শ্লোক নং-১ এ বলা হয়েছে– 'সত্যিই স্বর্গীয় স্রষ্টার গৌরব অত্যন্ত সুমহান।' (ঋগবেদ সমিতি, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১৮০২ ও ১৮০৩)
- ঋগবেদ খণ্ড-৬, স্তুতিস্তাবক-৪৫, এর ১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে– 'তাঁরই প্রশংসা করো যার কোনো তুলনা নেই এবং তিনি একক।' (র‍্যাঙ্ক টি. এইচ. গ্রিফথ কর্তৃক রচিত ঋগবেদ, পৃষ্ঠা-৬৪৮)

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে– *"ইক কম ব্রাহম দিউতা নাস্তি নেহনা নাস্তি কিঞ্চন"* অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন এবং দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই, আদৌ নেই, কখনও ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

হিন্দুধর্মের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে নেয়া এসব ধারা স্পষ্টভাবে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান প্রভুর একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা প্রমাণ করে। উপরন্তু এসব ধারা সত্য প্রভু একক আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। এসব ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একেশ্বরবাদ তথা তাওহীদের ধারণাকে স্পষ্ট করে কেউ যদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন তবে তিনি হিন্দুধর্মের প্রভু সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে পারবেন।

ইসলামে 'প্রভু'

আল-কুরআন বিভিন্ন স্থানে একেশ্বরবাদ তথা তাওহীদের ধারণা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। সুতরাং আপনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে প্রভু তথা আল্লাহর ধারণা সম্পর্কিত বক্তব্যের মিল দেখতে পাবেন।

সূরা ইখলাস

মহান প্রভুর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা ইখলাস এর আয়াত- (১-৪) এ বলা হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : হে নবী (স) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।)। তিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

এখানে 'আস-সামাদ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক-চিরন্তন বা পরম অস্তিত্ব, শ্বাশত সত্য। অভাবহীন, দোষত্রুটিমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন। চিরন্তন অস্তিত্ব হওয়ার গুণটি একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং বিশ্বে অন্যসব প্রাণীর অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য এবং শর্তযুক্ত। আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী নন; বরং অন্যসব ব্যক্তি এবং বস্তুই তার ওপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী।

প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরা ইখলাস সূরাটি হচ্ছে প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর। "Theo" শব্দটি গ্রিক- যার অর্থ হচ্ছে 'প্রভু' এবং 'logy' অর্থ হচ্ছে 'তত্ত্ব'। এভাবে 'Theology' অর্থ হচ্ছে– প্রভুতত্ত্ব এবং সূরা ইখলাস হচ্ছে– প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর। আপনি যদি কোনো স্বর্ণের অলঙ্কার কিনতে বা বিক্রি করতে চান তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম এটাকে যাচাই করে নিতে হবে। এ ধরনের স্বর্ণ অলঙ্কারের যাচাই-বাছাই কেবল স্বর্ণকারের কষ্টিপাথরের সাহায্যেই করা সম্ভব। স্বর্ণকার স্বর্ণ অলঙ্কার কষ্টিপাথরের সাথে ঘষবে এবং এর রঙকে ঘর্ষণকৃত পাথরের রংয়ের সাথে তুলনা করে দেখবে। যদি এটার রং ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের রঙের মতো উজ্জ্বল হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, আপনার অলঙ্কারে ব্যবহৃত স্বর্ণ হচ্ছে ২৪ ক্যারেট প্রকৃত স্বর্ণ। যদি এটি উচ্চ গুণসম্পন্ন প্রকৃত স্বর্ণ না হয় তাহলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে, এটা হয়তো ২২ ক্যারেট স্বর্ণ, নয়তো ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ অথবা এটা আদৌ স্বর্ণ নয়।

প্রকৃতপক্ষে সূরা ইখলাস হচ্ছে– প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর। যেটা এ সত্য যাচাই করতে পারে যে, তুমি যে প্রভুর ইবাদত করছ তিনি প্রকৃত প্রভু নাকি মিথ্যা প্রভু। কারণ, সূরা ইখলাস হচ্ছে– কুরআনে প্রদত্ত সর্বশক্তিমান প্রভুর চার লাইনে দেয়া পরিচয়। যদি কেউ সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে এ চার লাইনের পরিচয়ের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। আমরা মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তা বলতে আল্লাহকে বুঝি। মহিমান্বিত কুরআনের সূরা ইখলাস হচ্ছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটা হচ্ছে 'ফুরকান' তথা পার্থক্যকারী। যেটা সত্য প্রভু এবং মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার খোদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সুতরাং পৃথিবীতে ভিন্নধর্মী মানুষ যেসব দেবতার উপাসনা করে সেসব দেবতা যদি পবিত্র কুরআনের

সূরা ইখলাসে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করতে পারে, তাহলে সে দেবতার উপাসনা করা অর্থবহ এবং সেই দেবতাই প্রকৃত প্রভু। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে, তবে সে দেবতাকে বর্জন করতে হবে।

আল্লাহর গুণাবলি

মহান আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

অর্থ : হে নবী (স) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, তবে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো না কেন তিনি সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী।

আল্লাহকে আপনি যেকোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু সে নামটি অবশ্যই সুন্দর হওয়া উচিত এবং সে নামটি এমন হওয়া উচিত নয় যাতে মানসিকভাবে প্রভুর কোনো কল্পনা অঙ্কিত হতে পারে।

মহান আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে 'আর রাহমান', 'আর রাহীম', অর্থাৎ, পরম দয়াবান, পরম দয়ালু এবং 'আল হাকীম' সর্বজ্ঞ। এতোসব গুণবাচক নামের মধ্যে একটিমাত্র নাম ইসমে জাত। আর তা হচ্ছে 'আল্লাহ'। পবিত্র কুরআন এ বাণীটির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, আল্লাহ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী। আল কুরআনে বর্ণিত এই সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমেই তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণিত। এখানে আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের একটিরও কোনো স্ত্রী-বাচক বা বহুবচন শব্দ নেই।

সূরা আল আরাফ এর ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থ : এবং উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের বর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই দেয়া হবে।

সূরা ত্ব-হা-এর ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই।

সূরা হাশর-এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

অর্থ ঃ (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রবল প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। যাকে তারা অংশী স্থির করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (২৪) তিনিই আল্লাহ তায়ালা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদাতা; উত্তম নামসমূহ একমাত্র তাঁরই। আসমানে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'আল্লাহ' অধিকতর পছন্দীয় নাম

মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকতে বেশি পছন্দ করেন। এ আরবি শব্দটি খাঁটি এবং স্বতন্ত্র আর এটি ইংরেজি শব্দ God এর মতো নয়। 'গড' শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হলো –

যদি আপনি 'গড' শব্দটির সাথে 's' অক্ষর যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Gods যেটা God শব্দের বহুবচন অথচ আল্লাহ হলেন এক এবং একক। তাই 'আল্লাহ' শব্দের বহুবচন হয় না। যদি আপনি God শব্দের সাথে dess যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Goddess যেটা হয় God শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ। অথচ মহিলা আল্লাহ কিংবা পুরুষ আল্লাহর ন্যায় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গভেদ নেই। আবার আপনি যদি God শব্দের সাথে Father শব্দটি যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় 'Godfather' যেমন, He is my Godfather. এর অর্থ হচ্ছে, তিনি আমার অভিভাবক। কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আবার আপনি যদি mother শব্দটি God এর সাথে যোগ করেন তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Godmother কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ আম্মু' কিংবা 'আল্লাহ মাদার' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যদি আপনি

banglainternet.com

God শব্দের পূর্বে Tin শব্দটি যোগ করেন তাহলে এটি হয় TinGod যার অর্থ হলো 'মিথ্যা প্রভু'। কিন্তু ইসলামে 'মিথ্যা আল্লাহ' কিংবা 'নকল আল্লাহ' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। 'আল্লাহ' শব্দটি হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র শব্দ। এটি দ্বারা মানসপটে কোনো কিছুর চিত্রাঙ্কন করতে পারে এমন কিছুকে বুঝায় না। আর এর পূর্বে কিংবা পরে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা যায় না। মুসলমানরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে বুঝাতে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহারকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা যখন অমুসলিমদের সাথে আলোচনা করে তখন আল্লাহর পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ শব্দ God এর ব্যবহার করে থাকে।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে 'আল্লাহ'

'আল্লাহ' শব্দটি– যা দ্বারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে বুঝায়, তার ব্যবহার হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতেও পাওয়া যায়। যেমন –

–ঋগবেদ বই-২, অনুচ্ছেদ-১, শ্লোক নং-১১

–ঋগবেদ বই-৩, অনুচ্ছেদ-৩০, শ্লোক নং-১০

-ঋগবেদ বই-৯, অনুচ্ছেদ-৬৭, শ্লোক নং-৩০

এছাড়া একটি উপনিষদ আছে যার নাম 'অল্লো' উপনিষদ।

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থে সমার্থক ভাষ্য

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসের (১-৪) নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। বিষয়টিকে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের আলোকে পর্যালোচনা করা যাক–

ইসলাম

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।

اللَّهُ الصَّمَدُ.

অর্থ : আল্লাহ চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.

অর্থ : তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

অর্থ : আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

হিন্দু ধর্ম

- তিনি কেবল একজন এবং অদ্বিতীয়। *(চান্দগোয়া উপনিষদ ৬ : ২ : ১)*
- তিনি সেই সত্তা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর কোনো শুরু নেই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু। *(ভগবদগীতা ১০ : ৩)*

  এবং তাঁর কোনো পিতা-মাতা নেই, নেই কোনো প্রভু। *(সুবাসভাট্টারা উপনিষদ ৬ : ৯)*
- 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' *(সুবাস ভাট্টারা উপনিষদ ৪ : ১৯ আর জজুরবেদ ৩২ : ৩)*
- হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসূত্র পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে–

  Ekam Brahm, devitity naste neh na naste kinchan.

  'সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন, দ্বিতীয় কোনো দেবতা নেই। আদৌ নেই, কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।'

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে দূত ও গ্রন্থ

এ পর্যায়ে আমরা এ দুটি প্রধান ধর্মে স্রষ্টার অনুগত ফিরিশতা বা দেবদূত সম্পর্কিত বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই-বাছাই করবো। একইসাথে ফিরিশতা ও দেবদূত এর মাঝে কোনো মিল বা অমিল আছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখবো।

ইসলামে ফিরিশতা

ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সাধারণত তাদেরকে দেখা যায় না। তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই এবং তারা সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন। নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকার কারণে তারা প্রভুর কোনো নির্দেশ অমান্য করতে পারেন না। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিরিশতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করেছেন। যেমন : হযরত জিবরাঈল (আ) কে আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ফিরিশতারা যেহেতু প্রভুর সৃষ্টি, তাই তারা প্রভু নয় তারা প্রভুর সেবক। মুসলমানরা কখনও ফিরিশতাদের উপাসনা করে না।

banglainternet.com

হিন্দুধর্মে দেবদূত

'দেবদূত' সম্পর্কে হিন্দুধর্ম গ্রন্থে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, একশ্রেণীর দেবদূত আছে– তারা এমন সব কাজ করে যেসব কাজ সাধারণ মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়। এসব হিন্দুদের কেউ কেউ ইসলামের ফিরিশতাদের সাথে দেবদূতদের তুলনা করেনি। তবে দেবদূতদের উপাসনা করে। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের সাথে দেবদূতদের কোনো তুলনা বা সদৃশ হয় না।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে কিতাব অবতীর্ণের ধারণা

আমরা ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, আসমানি কিতাব অবতীর্ণ এবং হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহে মানবজাতির দিকনির্দেশনার ব্যাপারে যেসব বক্তব্য রয়েছে সেগুলো আলোচনা করবো।

আল কুরআন

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ তা'আলা আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা রাদ-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ .

অর্থ : প্রত্যেক যুগেই একটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে মাত্র চারখানা কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। এগুলো হলো– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কুরআন। উল্লিখিত প্রতিটি কিতাবই ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তাওরাত এটি হযরত মুসা (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। যাবুর এটি হযরত দাউদ (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইঞ্জিলও ছিল ওহী। এটি হযরত ঈসা (আ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ওহী। আর এটি অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর।

আল কুরআন মানবজাতির জন্য সর্বশেষ কিতাব

পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাবই কেবল একদল নির্দিষ্ট মানুষের নিকট নির্দিষ্ট সময় এবং যুগের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

আর আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সমগ্র মানবতার হিদায়াতের জন্য। যেহেতু মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত অবতীর্ণ হওয়া

আসমানি কিতাব, তাই এটি কেবল মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি; বরং এটি সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া কুরআন কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর যুগের মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি; বরং এটি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে পথ নির্দেশক হিসেবে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহিমের ১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ .

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। আমি আপনার নিকট এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি– যা দ্বারা আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন। (তাদের কল্পিত প্রভুকে ত্যাগ করে সে প্রভুর পথে) যিনি পরাক্রমশালী এবং চির প্রশংসিত।

যেহেতু শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত এটি হচ্ছে চূড়ান্ত নির্দেশনা; সুতরাং এর যথার্থতা এবং পবিত্রতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এ জন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এ জিকর (কিতাব) নাযিল করেছি এবং আমিই এর (যে কোনো ধরনের বিকৃতি থেকে) হিফাযতকারী।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহিমের ৫২ নং আয়াতে আরো বলেছেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

অর্থ : এটি মানুষের জন্য একটি বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র মা'বুদ এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ .

অর্থ : রমযান এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথের স্পষ্ট দিকনির্দেশক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী।

এছাড়াও আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা যুমার-এর ৪১ নং আয়াতে বলেছেন– إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট মানবজাতির (নির্দেশনার) জন্য সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

আলকুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর কথা। এটি ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত অবতীর্ণ আসমানি কিতাব। এটি ইংরেজি পঞ্জিকার ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

সর্বোপরি পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থে আল কুরআনের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্মেও আল কুরআনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা শু'আরা এর ১৯৬ নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে– وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

অর্থ : নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লোকদের জন্য প্রেরিত কিতাবে এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আল কুরআনের বর্ণনা এবং মহান আল্লাহর এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাবের উল্লেখ পূর্ববর্তী সব ধর্মগ্রন্থে এবং অন্যসব ধর্মে পাওয়া যায়।

আল হাদীস

কুরআনের পর ইসলামের অন্য যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার নাম হাদীস। হাদীস হচ্ছে মহানবী (স) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সমষ্টি। এসব হাদীস মহিমান্বিত কুরআনের পরিপূরক। সুতরাং হাদিস ও কুরআনের মতো খোদায়ী ওহী এবং এগুলো কুরআনের কোনো বক্তব্যের বিপরীতও হতে পারে না।

কেননা সূরা রাদ-এর ১ নং আয়াতে আল্লাহ এ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করে ঘোষণা করেছেন– وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ অর্থাৎ যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য।

আর এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারেনা যে, রাসূল (স) এর কাছে যে ওহী আসতো তা শুধু কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থ- রাসূল (স) নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী কোনো কিছু বলেন না; বরং তার উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রেরিত হয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে রাসূল (স) কুরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলো তিলাওয়াত হয় না।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ

এখন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো। হিন্দুধর্মে দু'ধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, শ্রুতি এবং স্মৃতি।

শ্রুতি ঃ শ্রুতি হচ্ছে এমন সব বাণী যেগুলো শোনা গেছে, বোঝা গেছে, অনুধাবন হয়েছে ও অবহিত হয়েছে। আর এ শ্রুতিগুলোকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের বাণী, যা হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন এবং পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ। শ্রুতিকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে– বেদ এবং উপনিষদ। আর এ দু' শ্রেণীকেই মূল্যায়ন করা হয় স্বর্গীয় হিসেবে।

স্মৃতি ঃ স্মৃতি, শ্রুতির মতো এতো পবিত্র নয়। যদিও এটা বর্তমানে হিন্দুদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্মৃতি অবশ্য হচ্ছে স্মরণ করা বা স্মৃতিপটে অঙ্কন করা। এ হিন্দু সাহিত্যকর্মটি অনুধাবন করা সহজ। কারণ এটা জগতের সত্যসমূহকে প্রতীকবাদ এবং পুরাণতত্ত্বের আলোকে বর্ণনা করে। স্মৃতিকে স্বর্গীয় মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; বরং এটাকে মানবীয় রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্মৃতি তালিকা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজের কার্যাবলিকে বিধিবদ্ধ করে দেয়। এটি ব্যক্তিকে তার প্রাত্যহিক কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা দান এবং নিরূপন করে দেয়। এগুলো ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। স্মৃতিগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ধরনের লেখা নিয়ে গঠিত। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক এবং ইতিহাস গ্রন্থসমূহ।

শ্রুতি এবং স্মৃতি'র আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, হিন্দুধর্মে প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ, উপনিষদ এবং ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

বেদ

- সংস্কৃত শব্দ 'vid' থেকে 'বেদ' শব্দটি নেয়া হয়েছে। vid অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। সুতরাং 'বেদ' অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। বেদে চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে (যদিও তাদের মতানুযায়ী এ সংখ্যা ১,১৩১ এবং যার মধ্য থেকে প্রায় এক ডজনের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। পাঠান জেলীর মহা বৈশ্যের মতে, ঋগবেদ ২১ প্রকারের, অথর্ববেদ ৯ প্রকারের, জুজুরবেদ ১০১ প্রকারের এবং শামবেদ ১,০০০ প্রকারের)।

banglainternet.com

❑ ঋগবেদ, জজুরবেদ এবং শামবেদ– এসব গ্রন্থকে অধিকতর প্রাচীন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো একত্রে 'ত্রিবেদ' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' নামে পরিচিতি। 'ঋগবেদ' সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটি তিনটি দীর্ঘ এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। চতুর্থ বেদ হচ্ছে অথর্ববেদ। যেটি সবচেয়ে পরে রচিত হয়েছে। ঋগবেদ প্রধানত প্রশংসাসূচক গানের সঙ্কলন। জজুরবেদ ত্যাগের মহিমা সংক্রান্ত সূত্রাবলির সঙ্কলন। শামবেদ হচ্ছে সুর সঙ্গীতের সঙ্কলন। অথর্ববেদ হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক মন্ত্র সংক্রান্ত সূত্রাবলির সঙ্কলন।

❑ চার প্রকার বেদ সঙ্কলনের বা অবতীর্ণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোনো সর্বসম্মত মতামত পাওয়া যায় না। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতে, বেদগুলো ১,৩১০ মিলিয়ন বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্য পণ্ডিতের মতে, এগুলো ৪,০০০ বছরের চেয়ে অধিক পুরাতন নয়।

❑ একইভাবে এসব গ্রন্থসমূহ কোথায় এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও মতপার্থক্য রয়েছে তবুও বেদকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপনিষদ

'উপ' যার অর্থ 'নিকট', 'নি' যার অর্থ 'নিচ' এবং 'ষদ' যার অর্থ 'বসা' থেকে 'উপনিষদ' শব্দটি সঙ্কলিত। সুতরাং উপনিষদ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিচে এবং নিকটে বসা'। একদল লোক শিক্ষকের কাছ থেকে পবিত্র মতবাদসমূহ শেখার জন্য তাঁর নিকটে বসে। শ্যামকারার মতে, উপনিষদ শব্দটি 'ষদ' শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ ঢিলা করা, পৌছানো, কিংবা ধ্বংস করা। আর 'উপ' এবং 'নি' এখানে প্রত্যয় হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং উপনিষদ অর্থ হচ্ছে 'ব্রহ্মজ্ঞান' যার দ্বারা অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা হয়।

উপনিষদের সংখ্যা ২০০ টির বেশি। যদিও ভারতের ঐতিহ্যে এ সংখ্যা ১০৮টি বলে ধরা হয়। প্রধান উপনিষদের সংখ্যা ১০টি। যদিও, কেউ কেউ এ সংখ্যাকে ১০-এর বেশি আবার কেউ কেউ ১০ এর কম বা ৮টি বলে মনে করেন। তবে রাধাকৃষ্ণ এর মতে, এ সংখ্যা ১৮টি।

❑ 'বেদান্ত' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উপনিষদ। যদিও বর্তমানে শব্দটি উপনিষদ ভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাব্দিকভাবে বেদান্ত অর্থ হচ্ছে বেদের পরিসমাপ্তি। উপনিষদ হচ্ছে বেদের পরিশিষ্ট অংশ এবং কালানুক্রমে তারা বৈদিক যুগের শেষে এসেছিলেন।

❑ কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, বেদের চেয়ে উপনিষদ উৎকৃষ্টতর।

ঐতিহাসিক মহাকাব্য

হিন্দুধর্মে দুটি ঐতিহাসিক মহাকাব্য রয়েছে যাঁর নাম রামায়ণ এবং মহাভারত।

❑ রামায়ণ হচ্ছে একটি মহাকাব্য, যেটি রামের জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করে। অধিকাংশ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত। এটিতে শ্রী রামচন্দ্রের কাহিনী রয়েছে।

❑ মহাভারত হচ্ছে অন্য একটি মহাকাব্য, যেখানে দু'জন জাতিভাই অর্থাৎ পাণ্ডব এবং কৌরব-এর মধ্যে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও এখানে শ্রী কৃষ্ণের জীবন নিয়েও রয়েছে আলোচনা। অধিকাংশ হিন্দুই মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে কম-বেশি অবহিত।

ভগবদগীতা

ভগবদগীতা হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বজন পরিচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাভারত একটি অংশমাত্র এবং এর বিশ্বপর্বের ২৫-৪২ পর্ব অর্থাৎ ১৮টি পর্বে রচিত। এখানে শ্রী কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তারই বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

পুরাণ

পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পুরাণ যেটি সবচেয়ে বেশি পঠিত ধর্মগ্রন্থ। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রাচীন'। পুরাণে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, আর্য উপজাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং হিন্দুধর্মের দেবতাদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ বেদের ন্যায় অবতীর্ণ হওয়া বাণী। এটা বেদের সমসাময়িককালে অথবা বেদের নিকটবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহেশ্বেরী বৈশ্য পুরাণকে ১৮টি খণ্ডে বিভক্ত করেন। এসব খণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভৈষ্য পুরাণ। এটাকে এ ধরনের নামকরণের কারণ হলো, এতে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দুরা ভৈষ্য পুরাণের কথাকে প্রভুর কথা হিসেবে মনে করে। মহেশ্বেরী বৈশ্যকে এ বইয়ের নিছক সম্পাদক হিসেবে মনে করা হয়। আর এর প্রকৃত লেখক হলেন স্বয়ং প্রভু।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

বেদ, উপনিষদ, ভগবদগীতা ও পুরাণ ছাড়াও আরো কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেমন, মনুস্মৃতি, মনুবাহিন ইত্যাদি।

banglainternet.com

বেদ সবেচেয়ে নির্ভেজাল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঃ হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল হিসেবে বিবেচনা করা হয় বেদকে। কোনো ধর্মগ্রন্থই বেদের যথার্থতাকে বাতিল করে দেয় না। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, বেদের সাথে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের বৈপরীত্য দেখা দিলে, বেদের কথাই প্রাধান্য পাবে।

এভাবে আমরা ফিরিশতা এবং কিতাবের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের মধ্যে মিল খুঁজে পাই। পরবর্তী আলোচনাগুলোতে আমরা নবুওয়ত, পরকাল, ভাগ্যলিপি এবং ইবাদতের ব্যাপারে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা যাচাই করে দেখবো।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে নবী-রাসূল ও অবতার

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অন্যতম সাদৃশ্য হচ্ছে স্রষ্টা মানব মুক্তির জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করেছেন। স্রষ্টা মনোনীত ব্যক্তিদেরকে নবী-রাসূল বলা হয়। আর হিন্দু ধর্মে এরা অবতার নামে পরিচিত।

ইসলামে রাসূল

রাসূল এবং নবীগণ হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বাণী মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রাসূল প্রেরিত হন

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনূস-এর ৪৭ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

অর্থ : প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে এক এক জন রাসূল। ন্যায়দণ্ডসহ যখন তাদের রাসূল তাদের মাঝে উপস্থিত হন, তখন আর তাদের ওপর জুলুম করা হয় না।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

banglainternet.com

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই কোনো না কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি। এ মর্মে, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন এবং কতকের উপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিরের ২৪ নং আয়াতে বলেছেন–

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

অর্থ : এমন কোনো উম্মত ছিল না, যাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয় নি।

পবিত্র কুরআনের সূরা রাদের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

অর্থ : আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন পথপ্রদর্শক (নবী) ছিলেন।

কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত কয়েকজন নবী-রাসূল

বিপথগামী মানুষকে সুপথে পরিচালিত করতে আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল মনোনিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তাদের নাম ও সমসাময়িক পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ মনোনীত সে সকল প্রতিনিধিরা হলেন– হযরত আদম (আ), সালেহ (আ.) ইদ্রিস (আ), নূহ (আ), হুদ (আ), শীষ (আ) লুত (আ), ইবরাহীম (আ) ইসমাইল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), ইউসুফ (আ), শুয়াইব (আ), দাউদ (আ), সোলায়মান (আ), ইলিয়াস (আ), মূসা (আ), আজিজ (উযাইর) (আ.), আইউব (আ), যুলকিফল (আ), ইউনূস (আ), যাকারিয়া (আ), ইয়াহইয়া (আ), ঈসা (আ) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)।

কুরআনে বর্ণিত নবীদের কথা

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا.

অর্থ : আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের কথা ইতিপূর্বে আপনাকে বলেছি, অনন্তর অনেক রাসুল যাদের কথা আপনাকে বলিনি এবং আল্লাহ মূসার সাথে বাক্যালাপই করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন এর ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ .

অর্থ : আর আমি তো আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি; তাদের মধ্যে অনেকের ইতিহাস আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং অনেকের কথা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি।

নবী রাসূল প্রসঙ্গে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৭৩৭ নং হাদিসে এবং 'মাসনাদে আহমদ বিন হাম্বল' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৫-২৬৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ১ লাখ ২৪ হাজার নবী প্রেরিত হয়েছেন।'

পূর্ববর্তী নবীদের স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর পূর্বে যে সকল নবীর আগমন ঘটেছিল তাদের সবাই স্বগোত্রীয় এবং স্বজাতির লোকদের নিকটই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের দ্বারা প্রচারিত বাণী কেবল ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল

পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাব -এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .

অর্থ : মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সীলমোহর (সর্বশেষ)। আর আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ (স) প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি কেবল মুসলমানদের কিংবা আরবদের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত

হননি। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়া-এর ১০৭ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

পবিত্র কুরআনের সূরা সাবা-এর ২৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুখবরদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাতের ৫৬তম অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীকেই তার স্বগোত্রীয় লোকদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমি মুহাম্মদ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

হিন্দুধর্মে অবতার এবং রাসূলের ধারণা

সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী 'অবতার'

'অবতার' শব্দটি একটি সংস্কৃত পরিভাষা। এখানে 'অব' অর্থ হচ্ছে 'নিচ এবং 'তার' অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি উৎসব'। সুতরাং 'অবতার' অর্থ হচ্ছে নিচে অবতরণ করা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতারের অর্থ হচ্ছে– ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার (হিন্দু ধর্মতত্ত্বে) অবতরণ বা পৃথিবীতে আত্মাকে শারীরিকরূপে মুক্তি দান করা। সাধারণ কথায়, সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী অবতার হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভুর পৃথিবীতে শারীরিক অবয়বের রূপ ধারণ করে নেমে আসা।

একজন সাধারণ হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান প্রভু শারীরিক রূপ ধারণ করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করার বা মানবজাতির জন্য বিধান জারি করতে পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ' এর কোথাও 'অবতার' সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই। যেমন– শ্রুতি। এটা স্মৃতি তথা পৌরাণিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসের বইতে লেখা আছে।

হিন্দুধর্মের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থে অবতার

ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭-৮ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, 'হে ভারতবাসী, যখন সত্য অবলুপ্ত হবে এবং অসত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তখন আমি নিজেকে প্রকাশ

Contents

করবো সত্যকে রক্ষার জন্য, দুষ্টকে ধ্বংস করার জন্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।'

পুরাণের ৯ : ২৪ : ৫৬ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, 'যখন সত্য বিলুপ্ত হবে এবং পাপাচার বেড়ে যাবে, মহিমান্বিত প্রভু তখন নিজেকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত করেন।'

বেদ এবং ইসলামে অবতারের বদলে আছে রাসূলের ধারণা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন– ইসলাম একথা বিশ্বাস করে না; বরং তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন এবং তাদের সাথে উচ্চ পর্যায় থেকে যোগাযোগ করা হয় যাতে তারা মানবজাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারেন আর এসব ব্যক্তিদেরকে বলা হয় প্রভুর দূত বা সংবাদবাহক। আর এ দূত বা সংবাদবাহকরাই হলেন নবী। 'অবতার' সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, 'নিচে নেমে আসা' বা 'নিচে অবতরণ করা'। কিছু পণ্ডিত বর্ণনা করেছেন, 'প্রভুর অবতরণ' নির্দেশ করে যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের আবির্ভাব যাঁর সাথে প্রভুর বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। চার প্রকার বেদের বেশ কিছু জায়গায়ই প্রভুর সাথে মানুষের এ সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে যদি আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সাথে ভগবদগীতা এবং পুরাণের বক্তব্যকে তুলনা করে দেখি তাহলে আমরা ভগবদগীতা এবং পুরাণের ঐ বক্তব্যের সাথে একমত হবো যাতে 'অবতার' বলতে প্রভু কর্তৃক মানুষের মনোনয়নকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামে এ ধরনের মানুষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার গুণাবলি

যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা। একজন স্রষ্টা কখনো সাধারণ গুণের অধিকারী হতে পারেন না। তাকে অবশ্যই বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। কারণ, তিনিই গুণের আধার। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে স্রষ্টা যে বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন তা স্বীকার্য বিষয়। স্রষ্টার গুণাবলি সম্পর্কিত ধারণা উভয় ধর্মে প্রায় ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্রষ্টার মানবীয় রূপ ধারণের প্রয়োজন নেই

অতীতে অনেক অ-সেমিটীয় ধর্ম কিংবা অন্যান্য ধর্মও ছিল যেগুলো প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত দর্শনে বিশ্বাসী করতো। যেমন– স্রষ্টার মানবীয় রূপ ধারণ

করার ধারণা। যারা এতে বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সাধারণ যুক্তি রয়েছে। তারা বলেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এতোই নির্ভেজাল এবং পবিত্র যে তিনি মানুষের কঠোরতা, ব্যর্থতা, দুর্বলতা, অনুভূতি, আবেগ এবং লোভ সম্পর্কে অনবহিত। তিনি জানেন না, কীভাবে একজন লোক আহত কিংবা সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় তার অনুভূতি প্রকাশ করে। সুতরাং মানুষের আচরণ বা ব্যবহারকে শাসন করার জন্য স্রষ্টা পৃথিবীতে মানুষের রূপে নেমে আসেন। এ যুক্তির কারণে এটাকে খুবই বাস্তবসম্মত মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের এটা যাচাই করা দরকার।

সৃষ্টিকর্তা নির্দেশনামূলক পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন

ধরুন, আমি একটি টেপ রেকর্ডার উৎপাদন করি। তাহলে, কোনটি ভালো বা মন্দ টেপ রেকর্ডার তা জানার জন্য কি আমাকে টেপ রেকর্ডার হতে হবে? আসলে উৎপাদকের কখনোই নিজেকে একটি টেপ রেকর্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ ব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারের কী কী অসুবিধা হচ্ছে তা জানতে উৎপাদককে টেপ রেকর্ডার হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং উৎপাদনকারী হিসেবে ব্যবহারকারীর জন্য আমি একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা লিখে দিব। এ পুস্তিকায় আমি বলব, "একটি অডিও ক্যাসেট শোনার জন্য, প্লেয়ারটিতে প্রথমে একটি ক্যাসেট প্রবেশ করান এবং 'প্লে' চিহ্নিত বাটনে চাপ দিন। আবার বন্ধ করার জন্য 'স্টপ' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিন। যদি আপনি দ্রুত সামনে যেতে চান তাহলে 'ফাস্ট ফরওয়ার্ড' বোতামে চাপ দিন। এটিকে অতি উষ্ণ জায়গায় রাখবেন না তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটাকে পানিতে ডোবাবেন না, তাহলে এটি অকেজো হয়ে যাবে।' উৎপাদনকারী একটি নির্দেশনা পুস্তিকা অথবা ব্যবহারকারীরা পুস্তিকা লিখবেন যেটিতে ঐ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় কাজ লেখা থাকবে।

কুরআন মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা পুস্তিকা

মানুষের জন্য কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা জানার জন্য আমাদের প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োজন পড়ে না। তিনিই সেই সত্তা যিনি এ বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাঁর কেবল কর্তব্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্দেশিকা পুস্তিকা অবতীর্ণ করা। এ ধরণের পুস্তিকা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিচের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবে–

banglainternet.com

ক. মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
খ. কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে
গ. চিরন্তন সফলতা লাভের জন্য তাদের কী করা উচিত এবং কী ধরনের কাজ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত?

সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা পুস্তিকা হচ্ছে মহিমান্বিত আল কুরআন।

রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত

মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশিকা পুস্তিকা লেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অবতরণ করার প্রয়োজন হয় না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে মনোনীত করেন এবং তার সাথে কিতাবের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ধরনের মনোনীত লোকদেরকে বলা হয় আল্লাহর নবী বা সংস্কারক। আল্লাহ এ ধরনের লোকদের কাছে কিতাবের মাধ্যমে তাঁর মতামত বা দিকনির্দেশনা জানিয়ে দেন।

স্রষ্টার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

স্রষ্টা সবকিছু করেন না

কিছু কিছু লোক বলেন যে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন তাহলে তিনি কেন মানুষের রূপ ধরতে পারবেন না? যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, মানুষের গুণাবলি এবং প্রভুর গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা।

স্রষ্টা অমর

স্রষ্টা অমর কিন্তু মানুষ মরণশীল। আপনি একজন 'স্রষ্টামানব' হতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন অমর এবং একজন মরণশীল একই সাথে দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না। এটা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। স্রষ্টার কোনো শুরু নেই। কিন্তু মানব জীবনের শুরু আছে। আপনি এমন একজন ব্যক্তি হতে পারেন না যার শুরু নেই এবং একই সময়ে যার শুরু আছে। স্রষ্টার কোনো শেষ নেই। মানব জীবনের শেষ আছে। আপনি একই সময়ে এমন দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না যাদের মধ্য থেকে একজনের শেষ নেই এবং অন্যজনের শেষ আছে। এটা অর্থহীন।

স্রষ্টার আহারের প্রয়োজন নেই

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। মহিমান্বিত আল কুরআনের সূরা আনআমের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহর গুণ বা

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

অর্থ : আর তিনি সেই সত্তা যিনি খাওয়ান, কিন্তু তাঁকে খেতে হয় না।

স্রষ্টার বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রয়োজন নেই

স্রষ্টার বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা, অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সব তাঁরই।

মানুষের উপাসনা করা পাপ

স্রষ্টা যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তার স্রষ্টা হওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং একজন মানুষের উপাসনা করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করুন, আমি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষকের ছাত্র। আমি আমার পড়ালেখার বিষয়ে নিয়মিত তাঁর নির্দেশনা ও সহযোগিতা গ্রহণ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হলেন এবং তাঁর স্মৃতি বিলোপ হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর স্মৃতি এমনভাবে হারিয়ে গেল যা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখন পড়াশুনার ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের নির্দেশনা কিংবা সহযোগিতা চাওয়া আমার জন্য বোকামি ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কারণ, ঐ শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার পর যখন তার স্মৃতিলোপ পেয়েছে তখন তিনি আর পড়াশুনার নির্দেশনা প্রদানে বিশেষজ্ঞ নন। একইভাবে, কীভাবে একজন মানুষ এমন একজন স্রষ্টার উপাসনা করতে পারে এবং তাঁর নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করতে পারে যে তাঁর স্বর্গীয় যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজেকে আপনার এবং আমার মতো মানুষে রূপান্তরিত করেছে? যদি একজন মানুষ একজন মানুষের উপাসনা করে তাহলে অন্য লোকেরা আপনার এবং আপনার পাশে অন্যান্য লোকের উপাসনা করতে পারবে না কেন?

মানুষ স্রষ্টা হতে পারে না

অস্তিত্ব আছে এমন কোনো জীব একই সময়ে প্রভু এবং মানুষ উভয় গুণসম্পন্ন হতে পারে না। যদি স্রষ্টা তার ঐশ্বরীয় শক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে তিনি আর মানুষ হতে

পারেন না। কারণ, মানুষের ঐশ্বরীয় শক্তি থাকে না। আবার যদি প্রভু মরণশীল হন যেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের গুণ, তাহলে তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, প্রভু হলেন অমর। এছাড়া একই মানুষ প্রভু হতে পারে না। কারণ, মানুষের জন্য প্রভু হওয়া সম্ভব নয়। যদি এরূপ হওয়া সম্ভবই হয়– তাহলে আপনি এবং আমিও প্রভু হতে পারতাম এবং ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী হতে পারতাম। এ কারণেই প্রভু কখনো মানুষের রূপ ধারণ করবেন না অথবা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন না। পবিত্র কুরআন প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণার বিপরীত বক্তব্যের সমর্থক। কাজেই প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণা যৌক্তিক নয়।

স্রষ্টা অপ্রভুচিত কাজ করেন না

স্রষ্টা যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারেন-ইসলাম এ কথা বলে না। বরং ইসলাম বলে যে, আল্লাহর সমগ্র বস্তুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে চাই যে প্রভু সাধারণত সব কাজ করতে পারেন। কারণ তিনি স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী।

স্রষ্টা মিথ্যা বলেন না

স্রষ্টা কেবল প্রভুচিত কাজই করেন। তিনি অপ্রভুচিত কোনো কাজ করেন না। প্রভু মিথ্যা বলতে পারেন না। এমনকি মিথ্যা বলার কিংবা মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের ইচ্ছাও তিনি করতে পারেন না। প্রভু কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। কারণ মিথ্যা বলা অপ্রভুচিত কাজ। প্রভু যে মুহূর্তে মিথ্যা কথা বললে তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

স্রষ্টা অবিচার করেন না

স্রষ্টা অবিচার করতে পারেন না কিংবা কোনো অন্যায় কাজ বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছাও করতে পারেন না। তিনি এ ধরনের কাজ করবেন না এবং এ ধরনের কাজ তিনি করতে পারেন না। কারণ অন্যায়কারী বা অবিচারকারী হওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআন সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে বলেছে–

ان الله لا يظلم مثقال ذرة ـ

অর্থ : আল্লাহ কখনো সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না।

যে মুহূর্তে স্রষ্টা বা প্রভু অন্যায় কাজ করেন তখন তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যায়। চিন্তা করুন যে, প্রভু একই সময়ে প্রভু হতে এবং প্রভু না হতে পারেন না। তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঐশ্বরীয় গুণাবলি এবং অমরতার গুণাবলি সম্পন্ন হতে পারেন কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ও এসব গুণাবলির অধিকারী হয় কী করে?

স্রষ্টা ভুল করেন না

পরিপূর্ণতা কেবল সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর সৃষ্টি কখনো এ গুণের অধিকারী হতে পারে না। আমরা শুধু ধারাবাহিকভাবে উন্নতির চেষ্টা করতে পারি কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি না। কখনো ভুল করতে পারবেন না। ভুল করা মানুষের স্বভাব। ভুল করা অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআনে সূরা ত্বহার ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– ... لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

অর্থ : ... আমার প্রভু ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

ভেবে দেখুন প্রভু যদি ভুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহলে প্রভু যখন ভুল করতেন, তখনই তিনি আর প্রভু থাকতেন না। একইভাবে প্রভু ভুলে যাবেন না। কারণ ভুলে যাওয়া অপ্রভুচিত কাজ।

স্রষ্টা শুধু প্রভুচিত কাজই করেন

সকল বস্তুর ওপরই আল্লাহ ক্ষমতাবান।এরপরও তিনি প্রভুচিত কাজই করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আমাদের উপলব্ধির জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে একই কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

১. সূরা বাকারা, ১০৯ নং আয়াত
২. সূরা বাকারা, ২৮৪ নং আয়াত
৩. সূরা আলে ইমরান, ২৯ নং আয়াত
৪. সূরা নাহল,৭৭ নং আয়াত
৫. সূরা ফাতির, ১ নং আয়াত

উল্লেখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় মহান রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা, ক্ষমতা ও অনন্য গুণবালীর কথা ব্যক্ত হয়েছে।

স্রষ্টা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন

পবিত্র কুরআনের সূরা বুরুজের ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ
অর্থাৎ, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন।'

আমি নিশ্চিত, আপনি নিজে একথা বিনয় এবং বিশ্বস্তার সাথে স্বীকার করবেন যে, প্রভু কেবল প্রভুচিত বিষয়েরই ইচ্ছা পোষণ করেন, অপ্রভুচিত বিষয়ের তিনি ইচ্ছা

পোষণ করেন না। মানুষের জন্য আরোপীয় গুণাবলি যেমন– ভুলে যাওয়া, ভুল করা, দুর্বলতা অনুভব করা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ঈর্ষা এবং পছন্দ করা ইত্যাদি গুণ আল্লাহর জন্য আরোপ করার মাধ্যমে কেউ যেন তার প্রভুকে উপহাস করল এবং ঠাট্টায় মেতে ওঠল। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন আমরা মানুষেরা কীভাবে মানুষের এসব গুণকে প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করে থাকি! তাই এটা কি কোনো ভালো পছন্দ এবং সত্যিকার যাচাই নয় যে, আমাদের প্রভু এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি যা অজ্ঞ মানুষেরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত? এজন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন সূরা হাশর ২৩ নং আয়াতে বলেছে– سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থ : হে নবী (স) বলুন, মুশরিকরা যে বিষয় আল্লাহর সাথে শরিক করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবুয়তের ধারণা এবং প্রভুর গুণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ সিরিজের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পরকাল, অদৃষ্ট এবং ইবাদতের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করব। এখন আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবী হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তার আলোচনা উপস্থাপন করব।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (স)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে কেবল স্রষ্টার একত্ববাদের কথাই ঘোষিত হয়নি। শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবকেও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যের বিভিন্ন শ্লোকে প্রকাশ করা হয়েছে নবী মুহাম্মদ (স) এর আগমনী বার্তা।

ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মদ (স) নবী স্বীকৃত

ভবিষ্য পুরাণের প্রাতীস্বরাজ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩ এর ৫ থেকে ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'একজন বিদেশী, যিনি বিদেশী ভাষায় কথা বলবেন এবং আধ্যাত্মিক গুরু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। রাজা ভোজ, এই ঐশ্বরিক স্বভাবের ব্যক্তিত্বকে 'পঞ্চগভা' এবং গঙ্গার পানিতে গোসল করানোর (সব পাপ থেকে তাকে পবিত্র করণের) পর তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শনের পর এ প্রস্তাব দিবেন যে, "আমি আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আর আপনি হলেন মানবজাতির জন্য গৌরবের বিষয়; আরবের অধিবাসী। আপনি শয়তানকে হত্যা করার জন্য একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন।'

এ সত্যটি বিভিন্ন শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। শ্লোকগুলোতে উল্লেখ আছে–

(১) নবীর নাম হবে মুহাম্মদ।

(২) তিনি হবেন আরবের অধিবাসী, সংস্কৃত শব্দ 'মরুস্থল' অর্থ হচ্ছে বালুময় জায়গা বা মরুভূমি।

(৩) নবীর সঙ্গী অর্থাৎ সাহাবীদের বিশেষ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মহানবী (স) এর ন্যায় অন্য কোনো নবীর এতো অধিক সংখ্যক সাহাবী ছিল না।

(৪) তাঁকে বিশ্বমানবতার জন্য গৌরবের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা 'কলম' এর ৪ নং আয়াতে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, মহান আল্লাহ রাসূল (স) কে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছেন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ .

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

সূরা আহযাব এর ২১ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

অর্থ : নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রাসূল (স) এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

(৫) তিনি অশুভ আত্মাকে হত্যা করবেন। অর্থাৎ তিনি সব ধরনের পাপাচার এবং শয়তানি উপাসনাকে ধ্বংস করবেন।

(৬) তিনি তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, রাজা ভোজ নবুওয়তের এ ধারণা বর্ণনা করেছেন একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগমনের ৫০০ বছর পরে। আর তিনি ছিলেন রাজা শ্যালিভ্যানের ১০ম বংশীয় অধস্তন। এসব লোক এ কথাটা উপলব্ধি করতে ভুলে গেছে যে, 'ভোজ' নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন না। মিসরীয় রাজাদেরকে বলা হতো 'ফারাও' এবং রোমান রাজাদের বলা হতো 'সিজার'। একইভাবে ভারতের রাজাদের বলা হতো 'ভোজ'। এ ধরণের 'ভোজ' রাজাদের সংখ্যা ছিল অনেক যারা একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে রাজা ছিলেন।

মহানবী (স) শারীরিকভাবে 'পঞ্চগভা' এবং গঙ্গার পানিতে গোসল করেননি। যেহেতু গঙ্গানদীর পানিকে পবিত্র মনে করা হয়, তাই গঙ্গার পানিতে গোসল করা

একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এর অর্থ হচ্ছে যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা অর্জন করা। এখানে নবুওয়তের ধারণায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) 'মাসুম' বা নিষ্পাপ ছিলেন।

একই গ্রন্থের শ্লোক নং ১০-২৭ নং-এ মহাঋষি ব্যাস নবুওয়াত সম্পর্কে বলেছেন, বিদেশি লোকটি যাঁর ভাষাও হবে বিদেশি, সুপরিচিত আরবভূমিকে কলুষিত করবে। দেশে আর্য ধর্মকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতোমধ্যে সেখানে একজন ভ্রষ্ট শয়তান উপস্থিত হবে যাকে আমি হত্যা করেছিলাম। সে এখন পুনরায় শক্তিশালী শত্রু হিসেবে উপস্থিত হবে। এসব শত্রুকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং তাদের পথনির্দেশনা প্রদান করার জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ, যিনি আমা কর্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশেষ দূত, দুষ্টলোকদের সঠিক পথে আনয়নের জন্য সদা ব্যস্ত থাকবেন। হে রাজা! তোমাকে বোকা বর্বরদের দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না; বরং তুমি যেখানে আছ সেখানে থেকেই আমার দয়ার দ্বারা পবিত্র হবে। রাতে ঐশ্বরিক মেজাজে, ধূর্ত লোকটি পিশাচের ছদ্মবেশে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজা! তোমার আর্য ধর্মকে সব ধর্মের উপরে স্থান দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার নির্দেশনা অনুযায়ী আমি মাংসভোজীদের শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ কার্যকর করেছি। আমার অনুসারীরা খৎনাবিশিষ্ট মানুষ হবে। তাদের মাথায় কোনো লেজ থাকবে না, দাঁড়ি রাখবে, আযানের ধ্বনির মাধ্যমে বিপ্লবের ঘোষণা দেবে এবং সব বৈধ জিনিস ভক্ষণ করবে। তারা শূকর ছাড়া সকল প্রকার জন্তুর গোশত খাবে। তারা পবিত্র গুল্মোদ্যানের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে না; কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করবে। ধর্মহীন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা 'মুসলিম' হিসেবে পরিচিত হবে। আমি গোশত খাওয়া জাতির ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।'

হিন্দুধর্ম ও ইসলামে পরকাল

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী। হিন্দুরা মৃত্যু পরবর্তী সময়কে পুনর্জন্ম এবং মুসলমানরা এ জীবনকে পরকাল বলে। উভয় ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধারণা ও কর্মফল বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদ

অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্রে বিশ্বাস করে, যাকে 'সমসার' বলা হয়। 'সমসার' কিংবা পুনর্জন্মবাদকে 'আত্মার পুনর্জন্মবাদ' বা 'স্থানান্তরবাদ'ও বলা হয়। এ মতবাদকে হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে পার্থক্য এমনকি জন্মের সময়ও যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এর কারণ হচ্ছে তাদের অতীত কর্ম অর্থাৎ পূর্বজন্মে তারা যে কাজ করেছিল তার প্রভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে অথচ অন্য একটি শিশু প্রতিবন্ধী কিংবা অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ পার্থক্য তাদের পূর্বের জন্মের কর্মের গুণেই হয়ে থাকে। যারাই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, যেহেতু এ জীবনে সকল কাজের ফলাফল প্রতিফলিত হতে পারে পারে না তাই তাদের কর্মের সব ফলাফল পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে অন্য জীবনের প্রয়োজন হয়।

ভগবদগীতার ২:২২ ধারায় বলা হয়েছে-'একজন মানুষ যেভাবে নতুন পোশাক পরিধান করে এবং পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে, আত্মাও একইভাবে নতুন দেহ গ্রহণ করে এবং পুরাতন ব্যবহারের অযোগ্য দেহত্যাগ করে।'

বৃহদারানিকা উপনিষদের ৪র্থ খণ্ডের : ৪নং অধ্যায়ে : ৩ অনুচ্ছেদে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে– 'একটা শুয়ো পোকা একগুচ্ছ ঘাসের ডগার ওপর ওঠে। তারপর অন্য ঘাসের ওপর লাফ দেয়। একইভাবে আত্মা নতুন শরীরে প্রবেশ করে নতুন অস্তিত্ব পায়।'

কর্ম ও ফলাফল

'কর্ম' মানে কাজ। শব্দটিতে কেবল দেহ দ্বারা সম্পাদিত কোনো কাজকে বোঝায় না; বরং মন দিয়ে সম্পন্ন কোনো কাজের পরিকল্পনাকেও বোঝায়। কর্ম হচ্ছে প্রকৃত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কিংবা কারণ এবং ফলাফলের বিধি। 'যেমন কর্ম তেমন ফল'– প্রবাদ দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই একজন কৃষক গম চাষ করে ধানের আশা করতে পারেন না। একইভাবে, প্রতিটি ভালো চিন্তার কাজ কিংবা বিষয় অন্য একটি সমান প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। আর প্রতিটি দয়াহীন চিন্তা, কর্কশ কথা এবং মন্দ কাজ আমাদের এ জীবন কিংবা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতি করার জন্য ফিরে আসে।

ধর্ম ও দায়িত্ব

'ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সত্য এবং সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন। এটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শ্রেণীভিত্তিক এবং বিশ্বময় সত্য ও সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভালো কাজ করার জন্য ধর্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা উচিত। অন্যথায় মন্দ কর্ম সম্পাদিত হয়। ধর্ম ইহকাল এবং পরকাল উভয়কেই প্রভাবিত করে।

পুনর্জন্মবাদ থেকে মুক্তি

'মোকসা' হচ্ছে 'সমসার' বা পুনর্জন্মবাদ চক্র হতে মুক্তি লাভ। প্রত্যেক হিন্দুর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে যে, পুনর্জন্মবাদ চক্র একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং তার আর নতুন করে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এটা তখনই ঘটবে যখন পুনর্জন্ম হওয়ার জন্য ব্যক্তির কোনো কর্ম অবশিষ্ট থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, তার ভালো এবং মন্দ কাজের কিছু বাকি থাকবে না।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে নির্ভেজাল ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করেনি, উপস্থাপন করেনি। এমনকি এর কথা উল্লেখও করা হয় নি। বেদে আত্মার স্থানান্তর তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও উল্লেখিত হয়নি।

'পুনর্জন্ম' মৃত্যু পরবর্তী জীবন বোঝায়

পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের জন্য সাধারণত যে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি হলো 'পুনর্জন্ম'। সংস্কৃত ভাষায়, 'পুণার' বা 'পুনা' অর্থ হচ্ছে 'পরবর্তী কাল' বা 'পুনরায়'। আর 'জন্ম' অর্থ হচ্ছে জীবন। সুতরাং 'পুনর্জন্ম' অর্থ হচ্ছে পরবর্তী জীবন বা পরকালের জীবন। এর দ্বারা মৃত্যুর পর পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় বার বার ফিরে আসাকে বোঝায় না।

কেউ যদি বেদ ব্যতীত অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কিত ধারনাগুলো অধ্যয়ন করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনকে কল্পনা করে তহলে সে মৃত্যুর পরের জীবনের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারবে কিন্তু বারবার পুনর্জন্মের কথা কোথাও খুঁজে পাবে না। ভগবদগীতা ও উপনিষদে পুনর্জন্ম সম্পর্কে যেসব বর্ণনা আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য। পুনর্জন্ম চক্র বা বার বার জন্ম সম্পর্কিত ধারণাটি বৈদিক যুগের পরে এসেছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন উপনিষদ এবং পুরাণে পুনর্জন্মের ধারণাটি মানুষের নিজস্ব সংযোজন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জন্মগত পার্থক্য, বিভিন্ন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট যাতে লোকজনেরা তাদের মধ্যে এ ধারণা পায় যে, 'সর্বশক্তিমান প্রভু মিথ্যা নয়' – এসব বিষয়কে যৌক্তিক এবং ব্যাখ্যা করার জন্যই পুনর্জন্ম ধারণাটির বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং প্রভু যেহেতু মিথ্যা নয় তাই মানুষের মাঝে যেসব পার্থক্য এবং অসমতা পরিলক্ষিত হয় তা কেবল তাদের অতীত জীবনের কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে। এ যুক্তির ব্যাপারে ইসলামের অত্যন্ত যৌক্তিক জবাব রয়েছে– যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

বেদে মৃত্যু পরবর্তী জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এটি পুনর্জন্মবাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে ঋগবেদের ১০ নং বইয়ের স্তুতিস্তাবক-১৬, শ্লোক নং-৪-এ

বর্ণিত আছে– 'অজাত অংশ, অগ্নির উত্তাপ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তাদের গৌরবকে আগুনের শিখায় জ্বলতে দাও, এর (জ্বালা) ভোগ কর, ঐসব সম্মানিত সদস্যদের সাথে যারা তোমাদের মধ্যে জাতভেদ সৃষ্টি করেছে, ধার্মিকদের সাথে ঐ জগতে নিয়ে চলো। সংস্কৃত শব্দ 'সুক্রিতাসু লোক' অর্থ হচ্ছে ধার্মিকদের কথা বা ধার্মিকদের অঞ্চল যার দ্বারা পরকালকে বুঝানো হয়েছে।

ঋগবেদের বই-১০, স্তুতিস্তাবক-১৬, শ্লোক নং-৫-এ আরো বলা হয়েছে-'......আকাশ সম্পর্কীয় জীবন, অবশিষ্ট অংশ (দেহের মতো) বিদায় নেয়, জাতভেদ দেহের সাথে মিশে যায়।' এ ধারাটিতেও দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে।

বেদে স্বর্গসুখ

বেদের বেশ কয়েকটি শ্লোকে স্বর্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– অথর্ববেদের বই-৪, স্তুতিস্তাবক-৩৪, ধারা-৬-এ (দেবীবান্দ) বলা হয়েছে, 'ননীর এসব ধারা, তাদের মধুর তীরে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা পণির, দুধ, মাখনের সাথে এবং পানি তোমার গৃহজীবনে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে আনন্দ বৃদ্ধি পায়। তুমি পূর্ণভাবে এসব বস্তু গ্রহণ করে রূপান্তরিত আত্মাকে শক্তিশালী করতে পারো।'

ইসলামে পরকাল

ইসলামী বিশ্বাস মতে, মৃত্যুর মাধ্যমেই মানব জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে না। মৃত্যুর পরেও আরেকটি জীবন আছে। সে জীবন অনন্ত জীবন। আর ঐ জীবনকালটাই হচ্ছে পরকাল।

ইসলামে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বলা হয় পরকাল

পরকাল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

অর্থ ঃ তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করছো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত অতঃপর তিনি তোমাদের জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। পরিশেষে তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

ইসলাম বলে, একজন মানুষ এ পৃথিবীতে কেবল একবারই আসে এবং পরে সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন সে পুনরায় জীবিত হবে। সে তার কাজের ওপর নির্ভর করে হয়তো জান্নাতে নয়তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।

ইহজীবন পরকালের পরীক্ষা

পবিত্র কুরআনের সূরা মুলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ .

অর্থ ঃ তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর কাজ করে (তা জানার জন্য)। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

ইহজীবনে আমরা যে সময় অতিবাহিত করি তা হচ্ছে পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা। যদি আমরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশগুলো মেনে চলি এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহলে আমরা জান্নাতে অর্থাৎ চিরশান্তির জায়গায় প্রবেশ করতে পারবো। আর যদি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশগুলো অনুসরণ না করি এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হই তাহলে আমরা প্রবেশ করব জাহান্নামে।

বিচার দিবসে প্রতিফল

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ .

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। আর তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিবসে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবে। পার্থিব জীবন একটি সামান্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

জান্নাত চিরস্থায়ী সুখের স্থান

জান্নাত বা বেহেশত হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী সুখের স্থান। আরবি 'জান্নাত' (جَنَّةٌ) শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বাগান। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত বিশদভাবে জান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন এ বাগানের তলদেশ দিয়ে পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এ নহর হচ্ছে একেবারে খাঁটি দুধের নহর এবং নহর পবিত্র ও বিশুদ্ধ মধু দ্বারা তৈরি। বেহেশতে সব ধরনের ফল থাকবে। সেখানে কোনো ধরনের অশান্তি থাকবে না এবং কোনো ধরনের মন্দ কথা-বার্তা বা আলোচনাও সেখানে হবে না। সেখানে কোনো ধরনের পাপ, কঠোরতা, দুশ্চিন্তা, সমস্যা, বা দারিদ্র্যের স্থান নেই। এভাবে জান্নাতে থাকবে অনন্ত সুখ আর সুখ।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে–

❑ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

অর্থ ঃ যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এতে রয়েছে সতী-সাধ্বী নারীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।

❑ সূরা আলে-ইমরানের ১৯৮ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا .

অর্থ ঃ যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে।

❑ সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا . لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا .

অর্থ ঃ আর যারা ঈমান এনেছে সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের জন্য তাতে রয়েছে সতী-সাধ্বী রমণীগণ। আর আমি তাদেরকে সুদীর্ঘ ছায়ায় প্রবেশ করাবো।

৪. সূরা মায়িদার ১১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

অর্থ ঃ তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট তারাও প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট। এটাই মহান সফলতা।

৫. সূরা তওবার ৭২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

banglainternet.com

অর্থ ঃ আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং নারীদেরকে এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদেরকে উত্তম বাসস্থান দিবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের জন্য বড় পাওনা। এটাই সর্বোত্তম সফলতা।

এছাড়া নিম্নলিখিত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে—

১. সূরা হিজরের আয়াত নং ৪৫-৪৮
২. সূরা ক্বাফ-এর আয়াত নং ৩১
৩. সূরা হাজ্জের আয়াত নং ২৩
৪. সূরা ফাতিরের আয়াত নং ৩৩-৩৫
৫. সূরা ইয়াসীনের আয়াত নং ৫৫-৫৮
৬. সূরা আস্সাফফাতের আয়াত নং ৪১-৪৯
৭. সূরা যুখরুফের আয়াত নং ৬৮-৭৩
৮. সূরা দুখানের আয়াত নং ৫১-৫৭
৯. সূরা মুহাম্মাদ এর আয়াত নং ১৫
১০. সূরা আর রাহমানের আয়াত নং ৪৬-৪৭
১১. সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত নং ১১-১২

জাহান্নাম নিদারুণ যন্ত্রণার স্থান

নরক বা জাহান্নাম হচ্ছে নিদারুণ যন্ত্রণায় জায়গা, যেখানে পাপীরা ভীষণ যন্ত্রণার শিকার হবে এবং নরকাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ভোগ করবে অসহ্য যন্ত্রণা। এ অগ্নির জ্বালানি হবে একদল মানুষ এবং পাথর। এছাড়া কুরআন বর্ণনা করেছে যে, যতবার তাদের শরীরের চামড়া পুড়ে যাবে ততবারই নতুন গজাবে যাতে তারা যন্ত্রনা অনুধাবন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতে জাহান্নামের বিবরণ দেয়া হয়েছে-

১. সূরা বাক্বারার ২৪নং আয়াতে বলা হয়েছে-

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ .

অর্থ : যদি না পার, কখনোই পারবে না, আর তাহলে (জাহান্নামের) অগ্নিকে ভয় করা যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। বস্তুত কাফিরদের জন্যই তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. সূরা নিসার ৫৬নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا .

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার আয়াতের অস্বীকারকারীদের আমি (জাহান্নামের) অগ্নিতে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখন (নতুন) চামড়া পরিবর্তন করে দিব, যাতে তারা আযাবের স্বাদ ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ।

৩. সূরা ইবরাহিমের ১৬-১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে—

مِنْ وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاۤءٍ صَدِيْدٍ . يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ .

অর্থ ঃ তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম আর তাকে পান করানো হবে পুঁজ মেশানো পানি। ঢোক গিলে তা পান করবে কিন্তু গলার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সব জায়গা থেকেই যেন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে অথচ সে মরবে না। তার পশ্চাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

৪. সূরা হাজ্জের ১৯-২২নং আয়াতে বলা হয়েছে-

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ . يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ . وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ . كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ .

অর্থ ঃ এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। তাদের পেটে যা কিছু আছে তা বের হয়ে আসবে আর চামড়াও খসে পড়বে। তাদের জন্য রয়েছে লোহার দণ্ড। যখন তারা তার নিকষ অন্ধকার হতে বের হয়ে আসতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং (বলা হবে) উত্তপ্ত (অগ্নির) শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করো।

৫. সূরা ফাতিরের ৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۔

অর্থ : আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামে) অগ্নির শাস্তি। আর তাতে তারা মরে যেতে পারবে না এবং আযাবের সামান্য অংশও কমানো হবে না। আর এভাবেই আমি কাফিরদের প্রত্যেককে প্রতিদান (শাস্তি) দিয়ে থাকি।

ব্যক্তি পার্থক্যের যৌক্তিক ধারণা

হিন্দুধর্মে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুই ব্যক্তির বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জন্মে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা তার অতীত জীবনের কর্ম অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাজের পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুনর্জন্ম চক্রের কোনো বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

ইসলাম কীভাবে এ পার্থক্যের ব্যাখ্যা করে? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ ইসলামী ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনের সূরা মুলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে-

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۔

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে তা পরীক্ষা করতে পারেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

সুতরাং আমরা যে জীবনযাপন করি তা পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র। এ জন্য ইহকালকে পরকালের শস্যক্ষেত্রও বলা হয়।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে অদৃষ্টবাদ

ইসলামে তাকদীর

আরবি قدر 'ক্বদর' হচ্ছে নিয়তি। মানব জীবনের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। যেমন– কোথায় এবং কখন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করবে, কোন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে সে জন্মগ্রহণ করবে, কত বছর সে বাঁচবে, এবং কোথায় ও কীভাবে সে মৃত্যুবরণ করবে, এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত।

হিন্দুধর্মে নিয়তি

হিন্দুধর্মে নিয়তির ধারণা বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুরূপ। যেমন– জন্ম, কর্ম, মৃত্যু, প্রতিদান প্রভৃতি স্রষ্টার ইচ্ছা নির্ভর।

পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষা

পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে যাতে স্পষ্ট করে ঐসব বিষয়কে নির্দিষ্ট করেছে যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা আমাদের পরীক্ষা করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔

অর্থ : মানুষেরা কি ধারণা করেছে যে তারা বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি'– আর (সাথে সাথে) তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۔

অর্থ : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা নিঃক্লেশে বেহেশতে চলে যাবে, অথচ এখনো তোমাদের ওপর তেমনটা বিপদ আপতিত হয় নি যেমনটা তোমাদের পূর্বে বিগত জাতির ওপর আপতিত হয়েছে? তাদের ওপর পতিত হয়েছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ এবং তারা এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে, রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল, নিরাশ হয়ে তাদের বলতে হয়েছিল, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শুন হে! নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য একান্তই কাছে।

সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۔

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ এবং উত্তম জিনিস দ্বারা কঠোরভাবে পরীক্ষা করার ন্যায় পরীক্ষা করব? আর আমার নিকটেই তোমরা ফিরে আসবে।

সূরা বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ
وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ফলমূল, জীবন ও সম্পদের বিনষ্টিকরণের দ্বারা। আর আপনি (এসব ব্যাপারে) ধৈর্যশীলদের সুখবর দান করুন।

সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ أَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটই উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী বিচার হবে

প্রতিটি মানুষকেই এ পৃথিবীতে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এ পরীক্ষার ধরন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারণ, এ পরীক্ষা করা হয় আল্লাহ ব্যক্তিকে যে সুযোগ-সুবিধায় রাখেন তার ওপর ভিত্তি করে। আর তিনি তার বিচারও ভিন্ন ভিন্ন করে সম্পন্ন করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষক একটি কঠিন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন, তাহলে তার উত্তরপত্র সাধারণত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে যাচাই করেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষক যদি সহজ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন তাহলে তার উত্তরপত্র সাধারণত যাচাই করেন কঠোরভাবে।

অনুরূপভাবে, কিছু কিছু মানুষ ধনী পরিবারে আবার কিছু কিছু মানুষ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রত্যেক ধনী লোক যার যাবতীয় খরচের পর সঞ্চয়ের নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণমূল্যের সমান হয়- তার ঐ সম্পদের ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রতি বছর দরিদ্রদের প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামে এ পদ্ধতিটিকেই 'যাকাত' বলে। কিছু ধনী লোক সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে বাকিগুলো দান করতে পারে। আবার কিছু সংখ্যক লোক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রেখে বাকিটা দান করতে পারে। আবার কিছু লোক একেবারেই যাকাত আদায় নাও করতে পারে। এভাবে একজন ধনী লোক যাকাতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দানের কারনে পূর্ণ নম্বর পেতে পারে। অন্য একজন তার চেয়ে কম নম্বর পাবে; আবার অন্য একজন ০ (শূন্য) নাম্বারও পেতে পারে।

অপরপক্ষে, একজন দরিদ্র লোক যার ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ সঞ্চয় হয়েছে- সেও যাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে। কারণ এ লোকের জন্য

যাকাত ফরয হয় নি। যে কোনো মানুষই ধনী হতে চায় এবং কেউই দরিদ্র থাকতে চায় না। কেউ কেউ ধনী লোকদের প্রশংসা করে এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কিন্তু সে জানে না যে, একই সম্পদ যা ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে তার যাকাত আদায় না করে। আর সম্পত্তির কারণে সে লোভী চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। অন্যদিকে একজন দারিদ্র তা তাকে নিঃসন্দেহে নিয়ে যেতে পারে জান্নাতের পথে যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। একজন ধনী লোক তার জনসেবার মাধ্যমে সহজেই জান্নাত অর্জন করতে পারে। আবার একজন দরিদ্র লোক যে মারাত্মকভাবে সম্পদের লালসা করে এবং তা পাওয়ার জন্য অবৈধ পথ অবলম্বন করে সে শেষ বিচারের দিনে সমস্যায় পড়বে।

সন্তান পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা

কিছু কিছু শিশু সুস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আবার কিছু কিছু শিশু পঙ্গু অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু সুস্বাস্থ্য বা পঙ্গুত্ব যা নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক সে নিষ্পাপ বা 'মাসুম'। এ ধরনের কোনো কথা নেই যে, পূর্ববর্তী জীবনের পাপের কারণে সে পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এ ধরনের বিশ্বাস অন্য মানুষের প্রতি হৃদয়বান হওয়ার গুণের ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি করবে। তাহলে অন্যরা বলতে পারবে যে, এ শিশুটি তার জন্মকে কলুষিত করেছে বা পঙ্গু হয়েছে কারণ এটা তার মন্দ কর্মের ফল।

ইসলাম বলেছে, এ ধরনের পঙ্গু শিশু তার পিতা-মাতার জন্য এ অর্থে পরীক্ষা যে, তারা এজন্য তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? তারা ধৈর্য ধারণ করেন কি না? তারা তাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন কি না?

একটি বিখ্যাত উক্তি আছে যে, 'একজন লোক মনে কষ্ট পাচ্ছিল কারণ, তার পায়ে পরার জন্য জুতা ছিল না। কিন্তু যখন সে একজন পা-হীন লোককে দেখল তখন তার জুতা না থাকার মনোকষ্ট দূর হয়ে গেলো।

আল কুরআনে সূরা আনফালের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ أَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ ঃ আর তোমরা জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার রয়েছে।

banglainternet.com

Contents

আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? হতে পারে পিতা মাতা সৎকর্মশীল, ধার্মিক এবং জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত। এখন আল্লাহ যদি তাদেরকে জান্নাতের উচ্চতর আসনে স্থান দিতে চান; তাহলে তিনি তাদের পুনরায় পরীক্ষা করবেন অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে একটি পঙ্গু শিশু দান করবেন। এরপরও যদি তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন, তাহলে তারা উচ্চতর পুরস্কারের জন্য অর্থাৎ জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবেন।

সাধারণ একটি নিয়ম আছে যে, পরীক্ষা যত কঠিন হবে পুরস্কার হবে ততই উচ্চতর। কলা এবং বাণিজ্যে ডিগ্রী পাস করা তুলনামূলকভাবে সহজ আর যদি আপনি পাস করেন তাহলে কোনো বিশেষ ডিগ্রি ছাড়া আপনাকে কেবল গ্রাজুয়েট বলা হবে। কিন্তু আপনি যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী নিতে চান, যা অর্জন করতে অপেক্ষাকৃত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে আপনি গ্রাজুয়েট হওয়ার পাশাপাশি আপনাকে ডাক্তার বলে ডাকা হবে এবং 'ডা.' উপাধিটি আপনার নামের পূর্বে যোগ করে দেয়া হবে। একইভাবে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন, কাউকে স্বাস্থ্য দ্বারা, কাউকে রোগ দ্বারা, কাউকে অর্থ দ্বারা, কাউকে দারিদ্র দ্বারা, কাউকে অধিক পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা, কাউকে কম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এবং ব্যক্তিকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার দ্বারা এভাবে তিনি প্রত্যেককেই পরীক্ষা করে থাকেন।

মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, এ জীবন পরকারের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কুরআন এবং বেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য সেটা আত্মার স্থানান্তর বা 'সামসার' অর্থাৎ অতীত জীবনের পাপের কারণে হয় না। এসব বিশ্বাসকে পরবর্তীকারের ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং পুরাণে যোগ করা হয়েছিল। জন্ম এবং মৃত্যুর পুনর্ব্যক্ত চক্র সম্পর্কে বৈদিক যুগে কিছু জানা ছিল না এবং শোনাও যায় নি।

এখন আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে ইবাদত এবং জিহাদের ধারণার মধ্যে যেসব মিল রয়েছে তা আলোচনা, যাচাই এবং প্রকাশ করব। আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যেসব মিল রয়েছে সেটাও আলোচনা করব।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে উপাসনা

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে উপাসনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ধর্মে উপাসনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচারগত পার্থক্য থাকলেও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অমিল নেই।

ঈমান

অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং বাস্তবে আমল করার নাম ঈমান। ঈমানের বাংলা হচ্ছে 'বিশ্বাস'।

ঈমানের বৈশিষ্ট্য

সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের 'কিতাবুল ঈমানের' ৮নম্বর হাদীসে বর্ণিত। হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি পাঁচটি। যেমন–

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়া।

২. নামায প্রতিষ্ঠা করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. রমযান মাসে রোযা রাখা করা এবং

৫. হজ্জ আদায় করা।

ঈমানের সাক্ষ্য

ইসলামের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে এই ঘোষণা দেয়া, সত্যায়ন করা, সাক্ষ্য দেয়া এবং প্রমাণ বহন করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তা ইবাদত, আনুগত্যের অভিবাদন ও আত্মসমর্পণযোগ্য নন এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে হযরত মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন আল্লাহর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

নামায

নামায বা 'সালাত' অর্থ হচ্ছে সাহায্য বা সহযোগিতা চাওয়া। নামাযে আমরা মুসলমানরা কেবল আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করি না বরং আমরা তার প্রশংসা এবং তার পক্ষ থেকে হিদায়াতও কামনা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে একে একটি ন্যায়বিচার হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে,

banglainternet.com

মনে করুন, নামাযে সূরা ফাতিহার পরে, ইমাম সাহেব মহিমান্বিত কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি পড়লেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পাথর (উৎসর্গীকৃত), এবং তীর ধনুক (যা দ্বারা বিভক্ত করা হয়) অপবিত্র শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

ইমাম সাহেব নামাযে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত পড়লেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন যে, আমাদের মদ পান করা উচিত নয়, আমাদের জুয়া খেলা, মূর্তি পূজা এবং ভাগ্য গণণার কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়- এসব কাজই শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে এবং আমরা যদি সফলতা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায প্রতিষ্ঠা করুন। (কারণ) নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।

সুস্থ ও সুঠাম শরীর গঠনের জন্য মানুষের প্রতিদিন তিনবার খাবারের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে একটি সুস্থ মন গড়ার জন্য প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করা মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ইসরার ৭৮ নং আয়াতে এবং সূরা ত্ব-হার ১৩০ নং আয়াতে প্রতিদিন পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিজদাহ।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ .

অর্থ : হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর সামনে বিনয়াবনত হও এবং সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জের ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! রুকু কর, সিজদা কর, তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং ভালো কাজ কর। সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।

হিন্দুধর্মের সাথে সাদৃশ্য

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা এবং উপাসনার বিভিন্ন ধরন রয়েছে যার অন্যতম 'ষাষ্টাঙ্গ'। 'ষাষ্টাঙ্গ' শব্দটি 'সা' এবং 'আসৃঠ' যার অর্থ 'আট' এবং 'আং' যার অর্থ 'শরীরের অঙ্গ'-দ্বারা গঠিত। এভাবে 'ষাষ্টাঙ্গ' হচ্ছে উপাসনার এমন একটি ধরন যাতে শরীরের আটটি অঙ্গের স্পর্শ প্রয়োজন হয়। কোনো হিন্দু ব্যক্তি এ উপাসনা যথাযথভাবে পালন করতে চাইলে একজন মুসলমান তার সালাতে সিজদা আদায় করার সময় যে আটটি অঙ্গ অর্থাৎ কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা ব্যবহার করেন তাকেও এগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ

১. হিন্দুধর্মে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ ধারায় বলা হয়েছে, 'ঐসব ব্যক্তি যাদের বুদ্ধিমত্তাকে পার্থিব (সম্পদ) অর্জনের অভিপ্রায় দ্বারা হরণ করা হয়েছে তারাই প্রতিমা পূজা করে।'

২. সুভাস ভাট্টারা উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায়ও এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. জজুরবেদের ৩২তম অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'তাঁর কোনো প্রতিমা নেই।'

৪. জজুরবেদের ৪০তম অধ্যায়ের ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ যেমন : বাতাস, পানি, আগুন, ইত্যাদি উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। আর যারা সৃষ্ট জিনিস যেমন : টেবিল, চেয়ার, গাড়ি, প্রতিমা ইত্যাদির উপাসনা করে তারা অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।'

যাকাত

২.৫% যাকাত আদায় ফরয

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা এবং প্রবৃদ্ধি। প্রত্যেক ধনী মুসলমান যার সঞ্চয়কৃত অর্থের মূল্য কমপক্ষে নিসাব (৮৫ গ্রাম স্বর্ণ মূল্য বা

এর সমান) পরিমাণ তার উক্ত সম্পদের ২.৫% প্রতি চন্দ্রবর্ষে দান করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

সব ধনী ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

সম্পদের ভারসাম্য রক্ষায় যাকাত

যাকাতের নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.

অর্থ : সম্পদ যাতে কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হতে না পারে (সেজন্য যাকাত ফরয করা হয়েছে)।

হিন্দুধর্মে দান

হিন্দুধর্মেও দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে–

ঋগ্বেদের গ্রন্থ-১০, স্তুতিস্তাবক-১১৭, ধারা-৫-এ বলা হয়েছে, 'ধনীদের উচিত দরিদ্র ভিক্ষুকদের সন্তুষ্ট করা। আর তার উচিত তার দৃষ্টিকে দীর্ঘতর পথপানে আনমতি করা। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এখন একজন, এরপর হবেন অন্য একজন এবং যানবাহনের চাকার মতো তা চিরকাল ঘুরতেই থাকবে।'

'যদি এরূপ আশা করা হয় যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি দরিদ্র ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করবে তাহলে ধনী ব্যক্তিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। মনে রেখ যে, ধনী ব্যক্তি হিসেবে একজনের স্থানে অন্যজনের আগমন ঘটে, যেভাবে সারথির চাকাসমূহ একটির স্থানে অন্যটির আগমন ঘটে।'

ভবদ্গীতার বেশ কয়েকটি জায়গায় দান করার বিষয়ে বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, ১৭তম অধ্যায়ের ২০ নং ধারা এবং ১৬তম অধ্যায়ের ৩ নং ধারা।

রোযা

সিয়াম বা রোযা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের রমযানের পূর্ণমাস সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকাই রোযা।

রোযা আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়

রোযা রাখার কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৮৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো।

আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি একজন ব্যক্তি তার ক্ষুধাকে সংবরণ করতে পারে, তাহলে তার পক্ষে অধিকাংশ ইচ্ছাকেই সংবরণ করা খুবই সহজ ব্যাপার।

মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে রোযা

একটানা এক মাস রোযা রাখা মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। যদি একজন লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, তবে তার জন্য একদিনের পুরো ২৪ ঘণ্টা মদ্যপান থেকে বিরত থাকা খুবই সহজ কাজ হয়ে যায়। যদি একজন লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেও ধূমপান থেকে বিরত থাকতে পারে।

রোযার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

রোযার বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য হলো রোযা অন্ত্রের শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং কোলেস্টরলের মাত্রাও কমায়।

হিন্দু ধর্মে উপবাস

হিন্দুধর্মে রোযার বিভিন্ন ধরন এবং পদ্ধতি রয়েছে। মনুস্মৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ নং ধারায় উপবাস বলা হয়েছে, 'পবিত্রতা অর্জনের জন্য একমাস উপবাস পালন করা উত্তম।'

মনুস্মৃতির ৪র্থ অধ্যায়ের ২২২ নং ধারায় এবং মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ২০৪ নং ধারায় উপবাস সম্পর্কে আরো বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে।

হজ্জ

ইসলামের অন্যতম আরেক স্তম্ভ হজ্জ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান যার হজ্জ করার অর্থাৎ পবিত্র নগরী মক্কায় গমন করার আর্থিক সঙ্গতি আছে–তার জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধে হজ্জ

হজ্জ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তব উদাহরণ। হজ্জ বিশ্বের বৃহত্তম বার্ষিক সম্মিলন যেখানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে এসে একত্রিত হয়। সকল তীর্থযাত্রীই দুই প্রস্থ সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে। এ কাপড় সাধারণত সাদা হয়, এভাবে এটা পরানো হয় যাতে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন না যে কে ধনী, কে দরিদ্র, কে রাজা, কে প্রজা। সকল গোত্রের এবং বর্ণের মানুষেরা একত্রে এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়।

হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রা

হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রার বিভিন্ন জায়গা নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম জায়গা হচ্ছে–

ঋগবেদের গ্রন্থ ৩. স্তুতিস্তাবক-২৯, ধারা-৪-এ বলা হয়েছে, 'ইয়াসপদ যেটি নব পার্থবিতে অবস্থিত।' "ইয়া" অর্থ হচ্ছে প্রভু বা আল্লাহ এবং স্পদ অর্থ হচ্ছে জায়গা। সুতরাং ইয়াসপদ অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্থান। 'নাবাহা' অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র এবং 'প্রাথবী' অর্থ হচ্ছে 'পৃথিবী'। এভাবে এ বেদের ধারাটিতে তীর্থযাত্রার স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

M. Monier Williams কর্তৃক সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানে (২০০২ সালের সংস্করণ) বলা হয়েছে যে, 'ইয়াসপদ' হচ্ছে 'তীর্থের নাম' অর্থাৎ তীর্থযাত্রার স্থান। যা হোক, এর সঠিক অবস্থান বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নি (তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলই এর মূল অর্থ)।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য নির্মিত প্রথম ঘর সেটা মক্কা নগরীতে অবস্থিত। আর এটি হচ্ছে পবিত্র গৃহ এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের দিশারী।

'বাক্কা' হচ্ছে মক্কা নগরীর অন্য নাম এবং আমরা আজ জানি যে 'মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।'

ঋগবেদের বই-৩, স্তুতিস্তাবক ২৯, ধারা-১১-তে মহানবী মুহাম্মদ (স) কে 'নরসঞ্চা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এ 'ইয়াসপদ' অর্থাৎ তীর্থযাত্রার স্থান-যা ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে– তা হচ্ছে মক্কা।

মক্কাকে 'ইয়াসপদ' হিসেবে ঋগবেদের গ্রন্থ-১, স্তুতিস্তাবক-১২৮ এবং ধারা-১-এও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে সংগ্রাম

এক শ্রেণীর মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যেই ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, আর তা হলো– ইসলাম জিহাদকে সমর্থন করে। অমুসলিম এবং মুসলিমদের ধারনা মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত যে কোনো যুদ্ধ– তা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, হোক তা ভালো কিংবা মন্দ–সবই জিহাদ।

جِهَادْ 'জিহাদ' جُهْد শব্দটি 'জুহুদ' থেকে সংকলিত হয়েছে। আর 'জুহুদ' অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা বা সংগ্রাম করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার প্রাণপণ চেষ্টা করে তাহলে সে 'জুহুদ' করছে। ইসলামি পরিভাষায়, 'জিহাদ' হচ্ছে নিজের মন্দ বা খারাপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। শব্দটির অর্থ এমনও হতে পারে– সমাজকে উন্নততর করার জন্য সংগ্রাম। এর দ্বারা আত্মরক্ষার সংগ্রাম কিংবা যুদ্ধের ময়দানে আগ্রাসন কিংবা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করাকেও বুঝায়।

জিহাদ 'পবিত্র যুদ্ধ' নয়

অমুসলিম পণ্ডিতরাই শুধু নন; বরং মুসলিম পর্যন্ত 'জিহাদ' শব্দের ভুল অর্থ করে বলেন, 'পবিত্র যুদ্ধ'। পবিত্র যুদ্ধের আরবি শব্দ হচ্ছে حَرْبٌ مُقَدَّسٌ 'হারবুন মুকাদ্দাসুন'। পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না।

'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের সময়– যাতে তারা খ্রিস্টধর্মের নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। বর্তমানে এ পবিত্র যুদ্ধ পরিভাষাটি অন্যায়ভাবে জিহাদকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ 'জিহাদ' অর্থ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা। ইসলামের পরিভাষা হচ্ছে– 'সঠিক কারণে আল্লাহর পথে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলানো।' যেমন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ।

banglainternet.com

জিহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

জিহাদ অর্থাৎ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। চেষ্টা-সংগ্রামের একটি ধরণ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নির্যাতন এবং হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা। অরুণ শূরীসহ কয়েকজন ইসলামের সমালোচক পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের উল্লেখ করেন। যাতে বলা হয়েছে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ

অর্থ ঃ ... মুশরিক এবং কাফিরদের হত্যা করো, যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও ...।

আপনি যদি কুরআন পড়েন, তাহলে এ আয়াতটি পাবেন, কিন্তু, অরুণ শূরী এটিকে প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করেছেন।

সূরা তাওবার ৫ম আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াতে মুসলমানগণ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ শান্তি চুক্তি একতরফাভাবে মক্কার মুশরিকদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছিল। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য চারমাসের চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেন, নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেন। আর তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের ময়দানের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'সংগ্রাম করো এবং মুশরিকদের (মক্কায় শত্রুদের) যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো এবং তাদেরকে ধরো এবং বন্দি করো। আর তাদের জন্য যুদ্ধের প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে বসে অপেক্ষা করো।'

আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সেনাবাহিনীর যে কোনো সেনাপতি সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য বলবে 'দুর্বল হয়ো না, লড়াই করো এবং শত্রুদের হত্যা করো তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে যেখানেই পাওয়া যায়।' অরুণ শূরী তার বই "The world of fatwas"-এ সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়ার পর এক লাফে ৭ নং আয়াতে চলে গেছেন। যে কোনো যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই বুঝবে যে ৬ নং আয়াত হচ্ছে অভিযোগের জবাব। সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

অর্থ ঃ যদি কোনো মুশরিক (শত্রুদের কেউ) তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনার সুযোগ পায় এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।

আজকাল কোনো দয়ালু সেনাপতি শত্রুদের ছেড়ে দিতে তার সৈন্যদের হয়তো বলতে পারে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যদি শত্রুরা শান্তি চায় তাদের শুধু ছেড়ে দিও না; বরং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এমন কোনো সেনাপতির কথা বর্তমান যুগে অথবা সমগ্র মানব ইতিহাস থেকে কি জানা যায় যে, কখনো এমন দয়ার্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন? আমরা এখন অরুণ শূরীর কাছে জানতে চাই তিনি কেন ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন না?

ভগবদগীতায় যুদ্ধ

প্রতিটি প্রধান ধর্মই তার অনুসরণকারীদের ভালো কাজের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে বলেছে। ভগবদগীতার ২:৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'অতএব হে বৎস! আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের জন্য প্রচেষ্টা করো, যেটা হচ্ছে সব কাজের কলা-কৌশল।'

আত্মরক্ষা কিংবা নির্যাতনের বিরুদ্ধে অথবা অন্যান্য সময়ে লড়াই–সংগ্রামের কথা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেই বলা হয়েছে। মহাভারত একটি মহাকাব্য এবং হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে দুই চাচাতো ভাই পাণ্ডবাস এবং কৌরাভাসের মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনীই প্রধানভাবে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে অর্জুন যুদ্ধ করাকে পছন্দ করেননি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অন্যায়ভাবে হত্যার পর তাকে নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে হত্যা করা হয়। এমন মুহূর্তে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের ময়দানে উপদেশ বাণী শোনান এবং এ উপদেশমালাই ভগবদগীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগবদগীতায় বেশ কটি ধারা আছে যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের সময় আত্মীয় হলেও শত্রুকে হত্যা করার উপদেশ দিয়েছেন।

❑ ভগবদগীতার ১ম অধ্যায়ের (৪৩-৪৫) নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

শ্লোক নং-৪৩. 'হে কৃষ্ণ! জনগণকে রক্ষা করো। আমি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শুনেছি যে, যারা পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট করে তারা চিরকাল নরকে বাস করবে।'

শ্লোক নং-৪৪. 'হায়! কি আশ্চর্য যে আমরা পাপাচারমূলক কাজের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছি। এ ধারণা রাজকীয় সুখ অর্জনের অভিপ্রায় থেকেই গৃহীত হয়েছে।'

শ্লোক নং-৪৫. 'ধৃতারাষ্ট্রের ছেলেরা আমাকে নির্মমভাবে এবং বিনাবাধায় হত্যা করার চেয়ে আমি বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অধিকতর উত্তম মনে করি।'

- কৃষ্ণের পিতা ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের (২-৩) নং শ্লোকে যে জবাব দিয়েছিলেন তাও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।
- কৃষ্ণের পিতা ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের (৩১-৩৩) নং শ্লোকে যা বলেছেন তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে।
- স্রেফ ভগবদগীতায়ই এরূপ শতাধিক ধারা রয়েছে যেগুলোতে যুদ্ধ এবং হত্যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

এসব শ্লোককে কুরআনের আয়াতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনে করুন, এখন যদি কেউ এভাবে বলেন যে, ভগবদগীতায় স্বর্গলাভের জন্য পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং সে গীতা থেকে যথার্থ অংশের উদ্ধৃতি দেয়া হলে এ ধরনের বক্তব্য বিতর্কের জন্ম দেবে। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে থেকে কেউ যদি বলেন যে, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করা জরুরি যদি তা নিজ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও হয়– তাহলে এ বর্ণনা সবাই সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন।

ইসলামের সমালোচকগণ বিশেষ করে হিন্দু সমালোচকগণ যখন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও হত্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন তখন আমি বিস্মিত হই। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন : ভগবদগীতা, মহাভারত এবং বেদ যথাযথভাবে অধ্যয়ন না করা।

- হিন্দুধর্মাবলম্বীসহ ইসলামের সমালোচকগণ কুরআন এবং নবী করীম (স) এর বিরুদ্ধে যখন বলেন, 'এতে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি জিহাদরত অবস্থায় নিহত হও, তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

তারা এক্ষেত্রে সহীহ্ বোখারীর ৪র্থ খণ্ডের কিতাবুজ জিহাদের ৪৬ নং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তিনি শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অন্যথায় তিনি তাকে সহীহ সালামতে পুরস্কারসহ বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

ভগবদগীতার একাধিক ধারায় যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্বর্গে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন : ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৩৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

'হে কুন্তির সন্তান, হয়তো তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে, নতুবা তুমি বিশ্বরাজ্যকে জয় করে তা উপভোগ করবে। অতএব জেগে ওঠো এবং দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করো।'

একইভাবে ঋগবেদের বই-১, স্তুতিস্তাবক-১৩২, শ্লোক নং ২৬ এবং আরো কয়েকটি হিন্দুধর্মগ্রন্থে যুদ্ধ এবং হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জিহাদের ব্যাখ্যা

মহান রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন– قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ : হে নবী (স) বলুন, এমন কথায় আসো যেগুলো তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্যই সমান।

ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারনা মোকাবেলার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থে যেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণী আছে তার উদ্ধৃতি পেশ করা।

আমি যখন এমন একজন হিন্দুধর্মাবলম্বির সাথে কথা বলবো যিনি ইসলামের জিহাদের ধারণার সমালোচক তিনি সহজেই স্বীকার করবেন, যখন মহাভারত এবং ভগবদগীতার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করবো। কারণ, মহাভারতে যুদ্ধ সম্পর্কে যে বিবরণ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা খুব ভালো জানেন। এতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে আল কুরআনের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করবেন। তারা সহজেই স্বীকার করবেন কুরআন যদি সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে তবে এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই এবং তারা আল কুরআনে বর্ণিত বাণীর প্রশংসা করবে'।

কুরআন ও বেদে সাদৃশ্য

বেদের বেশ কিছু ধারা আল কুরআনের আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে– যা নিরীক্ষা করলেই সচেতন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন।

কুরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১. সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা আল্লাহ তাআলার জন্য।
(সূরা ফাতিহা : ২)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

২. 'তিনি অত্যন্ত দয়ালু দয়াবান।' (সূরা ফাতিহা : ৩)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ .

৩. আমাদেরকে সঠিক বা সহজ পথ প্রদর্শন করুন, যে পথে ঐসব লোক চলে গেছেন যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথে নয় যারা বিপদগামী হয়েছে এবং যাদের ওপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। (সূরা ফাতিহা ঃ ৬-৭)

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۔ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۔

৪. আপনি কি তাকে দেখেছেন যে, বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? অতঃপর সে তো ঐ লোক যে ইয়াতিমদের গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং ইয়াতিমকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় না। (সূরা মাউন : ১-৩)

বেদ

১. 'নিশ্চয়ই স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার জন্য বৃহৎ গৌরব নির্ধারিত।' *(ঋগবেদ, ৫ : ৮১-১)*

২. 'সবচেয়ে বেশি দয়ার আধার।' *(ঋগবেদ ৩ : ৩৪ : ১)*

৩. 'আমাদেরকে উত্তম পথে চালিত করুন এবং পাপাচার থেকে মুক্তি দিন– যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং বিপদগামী করে।' *(জজুরবেদ ৪০ : ১৬)*

একই বাণী ঋগবেদের বই-১. স্তুতিস্তাবক-১৮৯, শ্লোক নং ১,২-এ বলা হয়েছে।

৪. 'ঐ লোক যার নিকট খাদ্য মওজুদ আছে, যখন কোনো অভাবী লোক অসহায় হয়ে তার নিকট খাদ্য ভিক্ষে করে তখন তার হৃদয় ঐ লোকের জন্য কঠোর হয়ে যায় এমনকি যদি কোনো বৃদ্ধ লোকও তাকে কাজ করে দেয় কাউকেই সে শান্তি দেয় না।' (ঋগবেদ ১০ : ১১৭ : ২)

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অনুশাসনে মিল

মদ নিষিদ্ধ

মদপান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

মাদক সম্পর্কে হিন্দুদের মনুস্মৃতিতে বর্ণিত আছে–

মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৩৫ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে– 'আত্মহত্যাকারী, মদপানকারী, চোর এবং গুরুজনের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী এদের সবাই প্রতারক এবং আলাদাভাবে মহাপাপী হিসেবে পরিচিত হবে।'

অনুরূপভাবে মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায়ের ২৩৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

'এসব মহাপাপী লোক, কারো তার সাথে একত্রে আহার করা উচিত নয়। কারো তার জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করা উচিত নয়। কারো তার সাথে অধ্যয়ন করা উচিত নয় এবং কারো তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। তাকে পৃথিবীর সব ধর্ম থেকেই বহিষ্কার করা উচিত।'

মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ৫৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে বলা হয়েছে–

'শিকারি প্রাণীকে হত্যাকারী, মদপানকারী, চোর, গুরুর বিবাহ করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং এসব কাজের সাথে জড়িত লোকদেরকে অবশ্যই মহাপাপী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।'

মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ৯৪ নং শ্লোকেও একই কথা বলা হয়েছে।

মনস্মৃতির বেশ কয়েকটি জায়গায় মদপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন–

১. মনুস্মৃতির অধ্যায়-৩, শ্লোক নং-১৫৯

২. মনুস্মৃতির অধ্যায়-৭, শ্লোক নং-৪৭

৩. মনুস্মৃতির অধ্যায়-৯, শ্লোক নং-২২৫

৪. মনুস্মৃতির অধ্যায়-১১, শ্লোক নং-১৫১

৫. মনুস্মৃতির অধ্যায়-১২, শ্লোক নং-৪৫

৬. ঋগবেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২, শ্লোক নং-১২

৭. ঋগবেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২১, শ্লোক নং-১৪

জুয়া নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۔

banglainternet.com

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্যনির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন–

ঋগবেদের বই- ১০, স্তুতিস্তাক-৩৪ এর ৩-৪ শ্লোকে বলা হয়েছে–

'একজন জুয়াখেলায় আসক্ত ব্যক্তি বলে, আমার স্ত্রী আমার সাথে শত্রুভাবাপন্ন, আমার মা আমাকে ঘৃণা করে। এসব উন্মাদ লোক কাউকেই সহ্য করতে পারে না।'

ঋগবেদের ১০ : ৩৪ : ১৩ শ্লোকে আরো বলা হয়েছে–

তাস খেলো না, অনুর্বর জমি চাষ করো না, লাভবান হও এবং মনে রেখ যে প্রচুর সম্পদ লাভ করবে।

মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৫০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

'মদ্যপান, জুয়া খেলা, স্ত্রীলোক (বিবাহ বহির্ভূত), শিকার করা এবং যে তার জানা অনুচিত এদের শ্রেণী হচ্ছে পাপী।'

খ. মদপানকে নিম্নোক্ত ধারাগুলোর দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১. মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৪৭ নং শ্লোক

২. মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২২১ ও ২২৮ নং শ্লোক

৩. মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৫৮ নং শ্লোক।

আমরা জানি সকলের বোধ সমান নয়। কেউ কেউ দশটি ইশারাতেই বুঝে ফেলেন আবার কিছু লোককে বোঝাতে একশটি ইশারার প্রয়োজন হয়। আবার কিছু লোককে হাজারো ইশারা দেয়ার পরও সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮ নং আয়াতে এসব বদ্ধ মানসিকতাসম্পন্ন লোকের ব্যাপারে বলেছে– صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

অর্থ ঃ এসব লোক বোবা, কানা অন্ধ তারা (সত্যপথে) প্রত্যাবর্তন করবে না।

সমস্ত প্রশংসা কেবল একক স্রষ্টা আল্লাহর জন্য, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায়। আমি প্রার্থনা করি যে, এ বিনয়ী কাজটি তিনি কবুল করে নেন। আর তাঁর নিকটই ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি।